ওয়ারিশ

ওয়ারিশ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



সিটি বুক এজেন্সী

প্রকাশক ও পরিবেশক

৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৫

প্রকাশক :

পি, দে

৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :

শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস প্রাঃ লিঃ

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন,

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী

শচীন বিশ্বাস

ওয়ারিশ



ঝক করে টর্চের ফোকাসটা মেরেই নিরাপদ বলল, আরিব্বাস! এ যে লহরী খেলছে। নেলো একটু পেছনে। এক হাতে গরুর দড়ি, অন্য হাতে ভরা থলি। গরুটা একটু পিছনে দাঁড়ানো। নেলো বলল, কাপড়খানা খুলে গামছাখানা পরে নেন। এ হল ভাসি গাঁয়ের জলা। তলায় তলায় ইছামতীর সঙ্গে যোগ আছে। বর্ষার ইছামতীর জল বাড়লে এই জলা একেবারে তল।

ঘুরপথ নেই?

তা থাকবে না কেন? পিছনবাগে চার মাইল গিয়ে দক্ষিণের রাস্তা ধরে গেলে পাক্কা পাঁচ ক্রোশ। তা সে রাস্তাও আপনার মনের মতো হবে না। হরেদরে কাশ্যপ গোত্র। এই রাস্তায় বরং সুবিধে আছে।

নিরাপদ খ্যাঁক করে উঠল, সুবিধে! সুবিধেটা কী দেখছ? জলার ভিতর দিয়ে ছাড়া কি আর পথ ছিল না?

জলা তো উই উত্তর দিকে। পোটাক পথ হবে। যে পথে যাচ্ছেন এটা ভাসি গাঁয়ের রাস্তা। জলার জল উঠে পড়েছে এসে। তা ভয় নেই।

কোমরের বেশি জল হয় না। সুবিধের কথাটা কানে তুললেন না। ভাসি গাঁ পেরোলে বোনাই গাঁ, তরপরই মহেশতলা। মহেশতলায় আমার শ্বশুরবাড়ি।

বলো কী?

রাত বেশি হয়নি। সাতটা সাড়ে সাতটা হবে। পা চালিয়ে গেলে নটা দশটায় পৌঁছে যাবো। রাতটা আজ ওখানেই থাকা যাবে। শ্বশুরবাড়ি বলতে আবার তেমন কিছু ধরবেন না। মাথাটা গোঁজা যায়। তা এই বাদলায় আর তার বেশি কী চাই?

তা বটে। কিন্তু কাপড়খানা যে ছাড়বো শুকনো জায়গা কি দেখতে পাচ্ছো? চারদিকে তো জল আর কাদা ছাড়া কিছু নেই।

সেইজন্যই তো তখন বলেছিলুম, ধুতি পরার আগে তলায় সেঁটে গামছা পরে নিন। কথাটা কানে তুললেন না। তা এখন আর লজ্জাই বা কিসের? চাদিকে জনমিষ্যি নেই। টর্চখানা নিবিয়ে ধুতিখানা আলগার ওপর খুলে মাথায় চাপিয়ে নিন।

এ জলে কি জোঁক আছে?

জোঁকের ওপর দিয়ে গেলে তো ভাগ্য ভাল। ছোটোখাটো কামট কুমিরও ঢুকে পড়ে। তা সে সব কথা ভাবলে আজ রাতটা এখানে বসেই কাটাতে হবে।

বিপদেই ফেললে হে।

আজ্ঞে আমি ফেললুম কোথায়? বিপদ তো আপনিই ঘাড়ে সেধে নিলেন।

নিরাপদ আর কথা বলল না। টর্চখানা নিবিয়ে ঝোলা ব্যাগ থেকে গামছাখানা বের করে কাঁধে রাখল। ছাতাখানা বগলে চেপে ধুতি খুলে গুছিয়ে তোলা বড় সহজ কাজ নয়।

তোমার শ্বশুরবাড়িতে শুকনো কাপড়চোপড় কিছু পাওয়া যাবে তো?

চলুন তো। ওখানে পৌঁছে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

নিরাপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আকাশে নতুন করে মেঘ জমছে।

ঝিলিক দিচ্ছে খুব। নামবে। বিকেলের দিকে জোর হয়ে গেল একচোট। দুধপুকুরে ঘণ্টা দুয়েক একটা চালাঘরে মাথা ঘুঁজে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। এখন আর চালাঘর পাওয়ার আশা নেই। সামনে জোঁক, কামট, কুমির, গলা জল। বৈদ্যপুর আজ আর পৌঁছোতে পারলেই হল। সে কি পৌঁছোনো যাবে?

ধুতিখানা ভিজে সপসপে। কাদাও লেগেছে মেলা। তবু শুকোলে পরা যাবে। ঝোলা ব্যাগে ধুতি, জামা, লুঙ্গি, সবই আছে। সব ভিজে ঢোল।

গামছাখানা পরলেন?

কোনওরকমে জড়িয়ে নিয়েছি।

তা হবে না। মাঝখানে একটা স্রোত আছে। কোমরটা কষে না বাঁধলে গামছা ভেসে যাবে। গিঁট মারুন।

তাই মারল নিরাপদ।

আমি এবার আগে যাই। আপনি পিছনে আসুন।

তোমার পিছনে যে গরু।

গরুর আগে থাকুন। দড়িটা ধরে রাখবেন।

খুব ধীরে ঠাহর করে নেলো জলে নামল। ব্যাগটা মাথায়। এর হাতে গরুর দড়ি ধরা। তার পিছনে নিরাপদ। তার পিছনে মস্ত গরুটা। গাঁয়ের লোকেরা শহরে-গঞ্জে গেলে সাতরকম কাজ সেরে আসতে ভালবাসে। নেলো গতকালই গরুটা কিনেছে। আজ আরও পাঁচটা কাজে দিনমান কাটিয়েছে। রওনাই তো হল পড়ন্ত বেলায়।

জল হাঁটু পর্যন্ত উঠল। কিছুক্ষণ আর তার ওপরে উঠল না। টর্চ জ্বেলে কিছু দেখার উপায় নেই। শুধু ঘোলা জল। তবে কুমির কামট থাকলে দেখা যাবে।

রাস্তায় বড় গর্ত টর্ত নেই তো হে!

গাঁয়ের রাস্তায় গর্ত থাকবে না তা কি হয়? মেলাই আছে। তবে বড় সড় নয়। ডান দিকটায় চেপে থাকুন।

গরুটা এই জলে তেমন জুৎ পাচ্ছে না। হাঁসফাঁস করছে। একটু টেনেই

নিতে হচ্ছে তাকে। অবোলা জীব, নিজের ইচ্ছেয় তো কিছু করতে পারে না।

কতখানি পথ, ও নেলোন্ত?

বেশি নয়। ঘাবড়াবেন না। বর্ষাকালে আমাদের নিত্যি যাতায়াত।

একটা হাউড় বাতাস দিল। তারপরই চড়বড় করে বৃষ্টি।

এই রে!

ছাতা খুলে লাভ নেই। তাতে আরও অসুবিধে। টর্চটা বাঁচাতে সেটা ঝোলা ব্যাগে পুরে ফেলল নিরাপদ। তাতে বাঁচবে কি না সন্দেহ। যা জল।

ঠিক যাচ্ছো তো!

আজ্ঞে। রাস্তা মুখস্থ। এই সামনে জল বাড়বে। সাবধান।

স্রোত?

আর একটু এগিয়ে।

নিরাপদ নিজের মাথায় বৃষ্টির ডুগডুগি শুনতে পাচ্ছে। ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটায় আর কথা কওয়া যাচ্ছে না। গরুটা দাঁড়িয়ে পড়তে চাইছে। টেনে হিঁচড়ে নিতে হচ্ছে তাকে।

জলটা বাড়ল ধপ্ করে। নেলোর অভ্যাস আছে বলে সামলে গেল, কিন্তু নিরাপদ পারল না। জলের নিচে পিছল পথ, হড়াস করে পা নেমে গেল নিচে, সে চিত হয়ে পড়ল জলে। দু ঢোঁক পেটেও গেল নাকি কে জানে বাবা! গরুটা দড়িতে টান খেয়ে লাফঝাঁপ মারছে।

চুবুনি খেয়ে যখন নিরাপদ উঠে দাঁড়াল তখন জল তার কোমর ছাপিয়ে উঠেছে।

পারা যাবে না। ফিরে চলো।

লাভ কী? যতটা এসেছেন সামনেও ততটাই পথ। হরে দরে কাশ্যপ গোত্র। এগোনোই ভাল।

পিসি আর মরার সময় পেল না? এই বর্ষাকালে?

কথা পরে। আগে জলটা পেরোই। গরুটা ভয় খাচ্ছে।

এমন জনমনিষ্যিহীন অন্ধকার আর এমন দুর্যোগে আর কখনও পড়েনি

নিরাপদ। সে গাঁয়ের ছেলে বটে, কিন্তু এরকম বেচাল জায়গা দেখিনি কখনও। তাও এখানেই শেষ নয়, এর পর স্রোতের জায়গা আছে।

তার নিঃসন্তান বিধবা পিসি মারা গেছে দিন পনেরো আগে। গাঁয়ের লোকেই দাহ করেছে। খবর পেয়ে একটা শ্রাদ্ধশান্তি নিজেদের গাঁয়েই করেছে নিরাপদ। কিন্তু কথা হল, পিসির সম্পত্তি। পাকা বাড়ি, চল্লিশটা নারকোল গাছ, দুধেল গাই, ধানী জমি মিলিয়ে কম হবে না। পিসেমশাইয়ের দিকের কোনও ভাগীদার এসে হাজির হওয়ার আগেই নিজের ঝাণ্ডাটি গিয়ে পুঁতে ফেলা দরকার। আইনের নানা প্যাঁচ আছে। কে কোথা থেকে উদয় হয়ে দাবিদার সেজে বসবে তার ঠিক কী? পিসের দিকটা একদম ঝাপসা। পিসি বিধবা হয়েছিল সতেরো বছর বয়সে। সতেরো থেকে আশি অবধি একা একা সব সামাল দিয়েছে। বিষয়-সম্পত্তির নেশাই বাঁচিয়ে রেখেছিল পিসিকে। এই এত বছর পিসেমশাইয়ের দিককার কেউ খোঁজখবর বড় একটা করেনি। এক ভাইপো নাকি ক্বচিৎ-কদাচিৎ আসত। সেও অনেক আগেকার কথা। নিরাপদর তখনও জন্ম হয়নি। সেই ভাইপোরও গত ত্রিশ বছর কোনও খোঁজখবর নেই। মরেটরেই গেছে। যদি বা বেঁচে থাকে তবে সে এখন বুড়োটুড়ো। এই অজ পাড়াগাঁ থেকে মৃত্যুসংবাদ গিয়ে পৌঁছোবে কখনও, এমন কথা নেই। সুতরাং পিসির সম্পত্তি তাকেই অর্শাচ্ছে।

তা পিসি যে তারও খুব আপনজন ছিল, দেখাসাক্ষাৎ হত তা নয়। নিরাপদর বাবা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন একটা ক্ষীণ যাতায়াত ছিল বটে। এক-আধবার সেই শিশুবয়সে এসেছেও পিসির কাছে। পিসি পেল্লায় রাগী মানুষ ছিল। নিরাপদর বাবা ছিল বয়সে পিসির বছর দুয়েকে ছোটো। সেই সুবাদে পিসি হল তার বাবার দিদি। কিন্তু নিরাপদর খুব মনে আছে, বাবা সামনে গেলেই পিসি হাত-পা ছুড়ে বাবাকে খুব বকাঝকা, গালমন্দ করত। বলত, এই বিধবা হয়ে ইস্তক এক কোণে পড়ে আছি, একটা খোঁজ নিস কখনও তোরা? একটা ভাল-মন্দে ডাক দিস? তাও তো তোদেরটা খেয়ে-পরে বাঁচতে হচ্ছে না।

আসিস কেন তা কি জানি না? কবে আমি মরব, কবে এসে সব গাপ করবি সেই মতলব তো। সব জানি।

তা পিসি কিছু মিথ্যেও বলত না। নিরাপদর বাবা গজপতি অভাবি মানুষ ছিল। নেশা ভাঙের ঝোঁক ছিল, শুয়ে বসে তাসটাস খেলে আর গাঁয়ে কুটকচালি করে সময়টা কাটিয়ে দিত। টানাটানির সংসার। মাঝে মাঝে পিসির বাড়িতে হানা দিত কিছু ধারকর্জ বা দাক্ষিণ্যের জন্যই। কিন্তু পিসি কঠিন মানুষ। সহজে হাত উপুড় করত না। তবে গজপতির দুই মেয়ের বিয়ের সময়ে দুহাজার করে টাকা দিয়েছিল কর্জ হিসেবে। টাকাটা বাবা শোধ করেনি। তার জন্য বিয়েবাড়িতেই পিসি সকলের সামনে খুব ঝেড়েছিল বাবাকে। মুখ তো নয় যেন লাউড স্পিকার। যেমন গলার জোর, তেমনি কথার ঝাঁঝ। প্রথম বোনটার বিয়ের কর্জটা শোধ দেয়নি দ্বিতীয় বোনের বিয়ের বাবদ আর একদফা ধার — পিসির দোষ কী? তারপর থেকে বাবা আর পিসির গাঁ-মুখো হত না। সম্পর্ক আর ছিলই না বলতে গেলে। বাবা যখন মারা গেল তখন খবর পেয়ে পিসি এসে কিছু কান্নাকাটি করে যায়। শ্রাদ্ধের খরচ বাবদ কিছু দিয়েছিল মায়ের হাতে। সেও আজ বছর পাঁচেকের কথা। এখন সেই পিসির জোত-জমি-বাড়ির দখল নিতে এই চলেছে নিরাপদ। নেলো পিসির গাঁয়ের লোক। পিসির জমি বাগান দেখাশুনো করে এসেছে বরাবর। ধর্মভীরু ভাল লোক। সেই এসে গতকাল বলল, আরে করছেনটা কী? দখল না নিলে সব সম্পত্তি যে বাঁটোয়ারা হয়ে যাবে।

নিরাপদও যাবে-যাবে করছিল। বর্ষাকাল বলেই যা একটু বাধা। পিসির গাঁয়ের রাস্তার খুব বদনাম। বর্ষাকালে নাকি নরক। ওদিকে নিরাপদর অবস্থাও ভাল নয়। কোনও দিকেই কিছু সুবিধে হচ্ছে না। গাঁয়ে করারই বা আছে কী? হাতে পয়সা থাকলে একটা ব্যবসার চেষ্টা করা যেত। বিদ্যে বলতে গাঁয়ের স্কুল থেকে মাধ্যমিকটা ঠেলে গুঁতিয়ে পাস করেছিল। তারপর আর এগোয়নি। বাড়িতে বিধবা মা, দুটো ভাই। কোনওরকমে মাথা গোঁজার মতো একখানা বাড়ি ছাড়া তাদের আর বিশেষ কিছু নেই।

মা ঘুঁটে বিক্রি করে, বাগানের কিছু তরিতরকারি ব্যাপারীরা নিয়ে যায় পয়সা দিয়ে। নিরাপদ টিউশনি করে, তবে তাতে আয় সামান্যই। জমি থেকে বছরের ধানটা টেনেমেনে উঠে আসে। বাপের স্বভাব নিরাপদও কিছু পেয়েছে। সেও একটু তাসটাস খেলে, আড্ডা দিয়ে বেড়াতে ভালবাসে, নেশা ভাঙও যে মাঝে মাঝে করে না তা নয়। পিসির সম্পত্তিটা মুঠোয় পেলে তার একটা হিল্লে হয়।

স্রোতটা কোন দিক থেকে কোন দিকে তা বুঝে ওঠার আগেই ধাক্কাটা লাগল। নেলো বলে উঠল, সামলে! সামলে!

কে কাকে সামলায়! স্রোতের এত জোর ভাবতে পারেনি নিরাপদ। তুমুল বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে গাঁক-গাঁক করে জলের তোড় বয়ে যাচ্ছে বাঁ থেকে ডাইনে। তাতেই নিরাপদ এক ঝটকায় ভেসে গেল কম করেও হাত দশেক। তার সঙ্গে গরুটাও। দড়ি ধরে ছিল বলে বেশি দূর যায়নি। তবে হাত থেকে দড়ি অনেকটাই বেরিয়ে যাওয়ায় সে আর নেলোর গরু একেবারে জড়াজড়ি হয়ে গেল। ছাতাটাও যাচ্ছিল।

নেলো পাকাপোক্ত লোক। স্রোতের মধ্যেও ঠিক খুঁটোর মতো দাঁড়িয়ে থেকে দড়ি ধরে রইল কষে। গলা তুলে বলল, ডুবজল নয় কর্তা, ভয় পাবেন না। পা ঠেকালে জমি পাবেন। দড়ি চেপে ধরে চলে আসুন।

ছাতা সামলে, থলি সামলে কাজটা সহজ নয়। থলিটা পৈতের মতো আড়া কাঁধে নেওয়া বলে ভাসেনি। নিরাপদ আকুমাকু করে জমিতে পা রেখে জল ঠেলে এগোলোও। গরুটাও এল। তারও অস্তিত্বের সংকট। নিরাপদর বাহ্যচৈতন্য অন্ধকারে লোপ পাচ্ছিল। শুধু গতিটা বজায় রাখা।

ধীরে ধীরে জল কমে তারা ফের হাঁটুজলে উঠে এল।

নেলো বলল, আর স্রোত নেই।

নিরাপদ হ্যাঁতানো গলায় বলল, আর কত দূর?

উই তো ডাঙা জমি।

ভবেশ মল্লিক তাকে বুঝিয়েছে আইনে আছে দখলদারেরই দাবি

পয়লা। দাবি যতই উঠুক, আদালত দেখবে কার দখলে সম্পত্তিটা আছে। তাহলেই কেল্লা অর্ধেক ফতে। নিরাপদ সেইটেই ভরসা করে আছে। আগে তো দখল, পরে অন্যকথা। তবে দখলও বড় সহজ নয়। গাঁয়ের মোড়ল মাতব্বররা নানা ফ্যাকড়া তুলবে। নানা প্রশ্ন উঠবে। তাদেরও স্বার্থ আছে। অতগুলো নারকোল গাছ, বাগান, জমি, ধানের গোলা, গাইগরু, পাকা বাড়ি, ঘরে সোনাদানা, বাসনপত্র, টাকা-পয়সা কম থাকার কথা নয়। একটা রাজ্যপাটই বলতে গেলে। মাতব্বররা লুটেপুটে খাওয়ার এমন সুযোগ ছাড়ে কখনও? গড়িমসি করে সে একটু দেরিই করে ফেলল নাকি? খবর তো পেল পিসির শ্রাদ্ধের মাত্র দুদিন আগে। গাঁয়ের মোড়ল নাকি একখানা পোস্টকার্ডে খবর পঠিয়েছিল। তা সে খবর পৌঁছোয়নি। পরে এক হাটুরে এসে খবরটা দিয়ে যায়।

হাঁটুর জল গোড়ালিতে নামল। তারপর ধীরে ধীরে একটা ঢালু বেয়ে ডাঙায় উঠল তারা ।

ফাঁড়া কেটেছে, ও নেলো?

টর্চবাতিটা কি জ্বলবে?

টর্চে তেইশ অনেক আগেই বেজে গেছে বলে টর্চবাতিটা বের করে সুইচ টিপল নিরাপদ। জ্বলল না।

নেলো একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, কী আর করা যাবে। গরুর গা থেকে জোঁকগুলো আর ছাড়ানো হল না তবে।

জোঁক?

আজ্ঞে। ও জিনিসের অভাব নেই। পায়ে টায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেখে নিন। বারো চৌদ্দটা লেগে গেছে এতক্ষণে।

নিরাপদর গা একটু শিরশির করল. তাহলে?

চলুন দেখি। ভামি গাঁয়ে চেনা বাড়ি আছে।

পরাণ মণ্ডলের অবস্থা ভালই। টিনের ঘর, পাকা মেঝে, মস্ত উঠোন। বৃষ্টির মধ্যে তারা দাওয়ায় উঠতে যেতেই দুটো কুকুর তেড়ে এল। পরাণ মণ্ডল আর তার দুই ছেলেও বেরিয়ে এল দা হাতে।

একজনের হাতে মস্ত টর্চ।

নেলো বলল, ওরে বাপরে মারবে নাকি? বিপদে পড়েই আসা। বাতিটা একটু দেখাও বাপু।

পরাণ মণ্ডল অপ্রস্তুত হয়ে বলল, কিছু মনে কোরো না, কালও বিধু সাহার বাড়ি ডাকাতি হয়ে গেল। তা এত রাতে কোত্থেকে? সঙ্গে ওটি কে?

নেলো এত কথার জবাব না দিয়ে বসে গেল পায়ের জোঁক ছাড়াতে। বলল, আলোটা ভাল করে ফেল তো। মেলা লেগেছে দেখছি।

নিজের পায়ের দিকে চেয়ে নিরাপদর মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম। অন্তত বিশ-পঁচিশটা জোঁক উরু থেকে পায়ের পাতা, এমনকি আঙুলের ফাঁকেও লেগে গেছে। ঘিনপিত ঝেড়ে সে পটাপট জোঁকগুলোকে শরীর থেকে ছিঁড়ে উঠোনে ছুড়ে ফেলতে লাগল। নেলো নিজের জোঁক সাফ করে গরুটাকে নিয়ে পড়ল।

পরাণ মণ্ডল বারান্দায় রাখা বেঞ্চিখানায় বসে কাণ্ডটা দেখতে দেখতে বলল, জলা পেরিয়ে এলে বুঝি?

হ্যাঁ।

গরুটা কত নিল?

পাঁচ হাজার।

সস্তায় পেয়েছো। আমার জার্সি গাইটা পড়েছিল সাত।

দু-চারটে কথাবার্তার পর উঠে পড়ল নেলো, আসি হে পরাণ।

এসো গিয়ে।

রওনা দেওয়ার পর নিরাপদ বলল, ও নেলো, রাতটা তো এ বাড়িতেই থাকা যেত।

পাগল নাকি? পরাণ মণ্ডল হাড়কেপ্পন লোক। এক গাল মুড়িও বের করত না নিজে থেকে। দরকার কী? এই তো পাশেই মহেশতলা। ভো করে চলে যাবো।

কত দূর?

মেরে কেটে মাইলটাক।

বৃষ্টিটা জোর হচ্ছে। ব্যাঙ ডাকছে, খুব। ভাসি গাঁ থেকে রাস্তাটা খারাপ নয়। পাথরকুঁচির রাস্তা। কাদা খুব একটা নয়। মহেশতলার সীমানায় ঢুকতেই বৃষ্টির তোড়টা কমে গেল। বাতাসটা রইল।

নেলোর শ্বশুরবাড়ি যা বলেছিল তাই। মোট চারখানা খোড়ো ঘর। একখানা বড় উঠোন।

নেলো হাঁকহাঁকি করায় লোকজন মেলা বেরোলো। শ্বশুর, শাশুড়ি, তিন শালা, তাদের তিনটে বউ, দুই শালী, আর গোটা সাতেক বাচ্চা কাচ্চা।

নেলো বলল, আজ এইখানেই দেহ রাখতে হচ্ছে ঠাকরুন। সঙ্গে অতিথি আছে। তারও আগে মা লক্ষ্মীর জাবনার ব্যবস্থা করতে হবে। পেট পড়ে আছে।

হাঁকে ডাকে কাজ হতে লাগল। লম্ফ আর লণ্ঠন হাতে এঘর-ওঘর ছোটছুটি। বৃষ্টির মধ্যেই। গরুর জাবনা জুটল, তাদের দুজনেরও ওই জাবনার মতোই জুটে গেল খানিকটা খিচুড়ি। শুকনো একখানা কাপড়ও ছিল বরাতে। নিরাপদর মনে হল স্বর্গসুখ বোধহয় একেই বলে।

সকালবেলায় বাদলা ছেড়ে সুয্যিঠাকুর উদয় হলেন। তারাও গুটি গুটি রওনা হয়ে পড়ল।

পিসির গায়ের নাম ভাঙন। সম্পন্ন গাঁ। পাঁচশো ঘর আছে। হপ্তায় দুদিন হাটও বসে। একখানা মুদিখানা আর একখানা ভূষিমালের দোকান আছে। ইস্কুল আছে। আর চাই কী? নিরাপদর মনটা খুব নাচানাচি করছে তখন থেকে। এই গাঁয়েই যদি পাকাপাকি থাকা যায় তবে তার হিল্লেই হয়ে গেল।

এই সকালবেলাটায় জলকাদা ভেঙে পথ হাঁটতে তার বড্ড ভালই লাগছে। সামনেই যেন মুশকিল আসান। সামনেই যেন রাজ্যপাট। হাতের নাগালেই যেন গুপ্তধন।

ও নেলো!

বলুন।

গাঁয়ের মাতব্বররা কি মানবে?

মানেবে না কেন? ঠিকমতো বুঝিয়ে বললে খুব মানবে।

পিসি একটা উইল টুইল করে গেলে ভাল হত।

কী যে বলেন তার ঠিক নেই।

কেন বলো তো?

উইল টুইলের কথা আমরা কানে শুনেছি বটে, কখনও চোখেও দেখিনি। আর বিন্দু পিসির কি মরার ইচ্ছে ছিল নাকি? মরার কথা ভাবলে তো উইলের কথা ভাববে। উনি ভাবতেন চিরটা কাল বিষয় আশয় নিয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে বেঁচে থাকবেন।

মনে হচ্ছে বেশ ঝামেলায় পড়তে হবে।

তা হবে একটু। আপনার পিসি আপনাদের তেমন পছন্দ করতেন না।

ত বটে। মাতব্বররা কি রকম চাইবে টাইবে বলে মনে হয়?

ভালই চাইবে। নতুন লোক আপনি, গাঁয়ে ঢুকতে যাচ্ছেন, বিষয় সম্পত্তি দখল করবেন, তা তার দক্ষিণাও আছে। দিয়ে থুয়ে যা থাকবে তাতেও পর্বত বুঝলেন তো!

বুঝেছে নিরাপদ। আবার বুঝেও খানিকটা বুঝের বাইরে থেকে যাচ্ছে। মনটা খচ খচ করছে বড়। ওয়ারিশান যদি বেরোয় তাহলে কি সে ধোপে টিকবে? পিসি মানে হল গোত্রান্তর, পিসির ভাইপো হল পরস্য পর। পিসেমশাইয়ের দিককার কেউ যদি এখন লাফ দিয়ে আসরে নামে তাহলেই সে কুপোকাৎ। ভবেশ মল্লিক এ কথাটাও তাকে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। মল্লিকের পো জানে মেলা। অনেক মামলায় সাক্ষী দিয়েছে কিনা! হরবখৎ হাসনাবাদ যাচ্ছে-আসছে। কলকাতাতেও যায়।

নেলো বলল, এই হরিপুর ছাড়ালুম। সামনেই ভাঙন।

ভাঙন দূর থেকেই দেখা গেল। বিখ্যাত শিবমন্দিরের মাথায় ধ্বজা উড়ছে। বুকটা কাঁপছিল তার। দখলটা নিতে পারলে আর কথা নেই।

পিসির বাড়িতে আছে কে বলো তো নেলো?

বাঘিনীই আছে একটা। মোক্ষদা দাসী। তাকে যমেও ভয় খায়। মোক্ষদার কথা ভাল মনে নেই তবে শুনেছে। পিসির কাছেই বলতে গেলে

মানুষ। এখন বয়স হয়েছে। সেই সব সামলায়।

নেলো বলল, মোক্ষদা দিদি না থাকলে এত দিনে সব লুটপাট হয়ে যেত। কিন্তু তাকে ভয় খায় না এমন বুকের পাটাওলা মানুষ এ গাঁয়ে নেই।

ভাঙন গাঁ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। শিবমন্দিরের গায়ে বাঁধানো পুকুর, তাতে টলটল করছে জল। বেশ কয়েকখানা পাকা বাড়ি আছে। তার মধ্যে দুটো দোতলাও। পথে লোকজন চলাফেলা করছে। বটগাছের তলায় বাঁধানো চাতাল। সেই চাতাল থেকে একজন হেঁকে বলল, ও নেলো, গরুটা কি কিনলি নাকি?

আজ্ঞে।

এ যে জার্সি গরু রে! দিব্যি হয়েছে। কত নিল?

পাঁচটি হাজার।

আজকাল আর টাকার দামই বা কী? দু বছরেই পয়সা উসুল হয়ে যাবে। দুধেল নাকি?

না। তবে পাল খাওয়ানো আছে। সদ্য গাভীন।

লটারি মেরেচিস। সঙ্গে কে রে?

কুটুম।

বাঃ বেশ! নতুন গাই, কুটুম, দিব্যি আছিস।

নিরাপদ চাপা গলায় বলল, লোকটা কে?

নেলো উদাস গলায় বলল, যদি এ গাঁয়ে থাকেন তাহলে টের পাবেন। ওটি হচ্ছেন দুর্গা বৈরাগী। লোকের পেছনে কাঠি দিতে ওঁর জুড়ি নেই। এই যে গরুটি দেখলেন, কালকেই এসে দুধের আগাম বন্দোবস্ত করে যাবেন। কিন্তু পয়সাটি আদায় করতে যান, দম বেরিয়ে যাবে।

পিসির বাড়ি দেখে নিরাপদর যেন জন্মান্তর হল। আহা, কী বাড়িখানাই না বানিয়েছিলেন পিসেমশাই। সামনে দু বিঘে জমি হবে হেসে খেলে। তাতে ফলন্ত ঢ্যাঁড়স, লঙ্কা। নেলো বলল, এসব বন্দোবস্ত করা আছে। নন্দ দাস দু হাজার টাকায় নিয়ে রেখেছে। লাঙল তার, ফসলও তার।

বুঝেছি।

পিছনের দিকে নারকোল গাছের চালচিত্তির, সামনে একতলা বাড়িখানা. পেটাই ছাদ, সামনে চওড়া বারান্দা। হোক পুরোনো, বাড়ি খুব মজবুত।

বারান্দায় একখানা কাঠের চেয়ারে কে একজন বসে ছিল। তাদের দেখে উঠে দাঁড়াল।

নেলো বলল, যান চলে ভিতরে। আপনারই বাড়িঘর।

তুমি আসবে না?

তার জো কী? গরু নিয়ে এসেছি, এখন বরণ-টরণ হবে। তারপর মা লক্ষ্মী ফলমুল খাবেন। অনেক হ্যাপা। আমাকে দরকারই বা কী? মোক্ষদা আছে। আপনি যে আসবেন সে জানে।

তবু একটু কেমন কেমন লাগছে। বারান্দায় ও-লোকটা কে?

নেলো ফটকের বাইরে থেকেই ঠাহর করে দেখে বলল, তাই তো! এ তো চেনা মানুষ বলে ঠেকছে না!

নিরাপদর বুকটা একটু কেঁপে গেল। লক্ষণ ভাল নয়। সে বলল, ওদিককার কেউ নয় তো?

নেলো মাথা চুলকে বলল, তা তো বুঝতে পারছি না। গিয়ে দেখুন একবার। কথা টথা কইলেই বুঝবেন।

যদি তাড়া করে?

করলেই হল? আপনিও তো ন্যায্য ভাইপো। ফ্যালনা তো নয়।

নিরাপদ একবার নিজের পোশাকের দিকে তাকাল। রাতের ওই ভেজা জামাকাপড় এখনও শুকোয়নি ভাল করে। কাদার বিস্তর দাগ। কাঁধে ভেজা ঝোলা ব্যাগ। চেহারাটা ভদ্রস্থ নয়। পিসির ভাইপো বলে পরিচয় দিলেও কি বিশ্বাস করবে? সাক্ষী-সাবুদ কই?

লোকটা একটু কড়া গলায় হাঁক মারল, কে? কাকে চাই?

নিরাপদ কাঁপা গলায় বলল, ও নেলো, তুমি বরং একটু দাঁড়িয়েই নাও। লোকটা মনে হয় অন্য তরফই হবে। তাহলে তো হয়েই গেল।

নেলো বলল, অন্য তরফ হলেই বা কী? আগে সাব্যস্ত হোক, তবে না দাবিদাওয়া। থাবা মারলেই তো হল না। যান না বুক চিতিয়ে। ভয়টা

কিসের?

ভয় যে কিসের তা নিরাপদ বলতে পারবে না। তার মতো মানুষের ভয়ের অভাবটাই বা কী? মেলা ভয়, মেলা অনিশ্চয়তা।

নেলো একরকম ঠেলেই ফটকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল তাকে। বলল, ঢুকে পড়ুন। ঢুকে পড়াটাই আসল কথা।

নিরাপদর আর পিছোনোর উপায় নেই। দুটো পা যেন অবশ অবশ লাগে। বুকের মধ্যে ধপাস ধপাস। এত কষ্ট করে আসা, সব বৃথাই গেল বুঝি!

লোকটা বারান্দার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। বুকটা বেশ চিতোনোই। গায়ে ফর্সা গেঞ্জি, পরনে ময়ূরকণ্ঠী লুঙ্গি। মাথায় টাক। সবচেয়ে বড় কথা, চেহারাটা ভদ্র গোছের।

কাকে চাই? ফের সেই কড়া গলা।

নিরাপদ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, স্যান্ডালের বিল থেকে আসছি।

সেটা কোথায়?

ওই দিকে। বলে ডানধারটার গোটা পৃথিবীর দিকেই হাত তুলে দেখাল নিরাপদ।

অ। তা কী কাজ?

আজ্ঞে এই এলাম একটু। ইনি আমার পিসি হতেন কিনা।

লোকটা চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, পিসি? বললেই হল?

সত্যি কথাই বলছি। পাঁচজনে জানে।

মতলবটা কী?

মতলব? না, তা কিছু নেই। এলাম আর কি। শ্রাদ্ধ টাদ্ধ করেছি কিনা।

শ্রাদ্ধ! লোকটা খাপ্পা হয়ে বলল, কিসের শ্রাদ্ধ? শ্রাদ্ধ করার তুমি কে হে? শ্রাদ্ধ তো করব আমরা। সে আমরা করেছিও। এক গোত্র নও, এক পরিবার নও, শ্রাদ্ধ করলেই হল?

নিরাপদ প্রমাদ গুনল। বাস্তবিক, পিসির শ্রাদ্ধ বোধহয় তার করার কাথাও নয়। সে মিনমিন করে বলল, করেই যখন ফেলেছি তখন আর কী

করা? না হয় সেটা ধরবেন না।

ধরব না সে তো ঠিকই। তোমার শ্রাদ্ধের জল কাকিমা পায়ও না। তা বলে শ্রাদ্ধ দেখিয়ে কিছু সুবিধে পাবে তা ভেবো না।

কাকিমা! তাহলে আর কথা কী? এ হল ওই তরফ। শুধু ও তরফই নয়। দখলও আগে সে নিয়ে ফেলেছে। নিরাপদ কাহিল মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিক থেকে বাড়িঘর, বাগান, নারকোল গাছ, ট্যাড়সখেত সব অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বড্ড বোকা লাগছে নিজেকে।

ঘন ঘন বার কয়েক গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমার নিজের পিসি।

নিজের পিসি তো কী হয়েছে?

আজ্ঞে কিছু হয়নি। কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলেন তো, তাই—

লোকটা ফ্যাঁচ করে হেসে বলল, বটে! বটে! তাই পিসি মরতে না মরতেই এসে গন্ধে গন্ধে হাজির হয়েছো! বলি মতলবটা কী? অ্যাঁ! কী উদ্দেশ্যে আসা?

নিরাপদ চারদিকে টালুমালু করে চেয়ে বলল, এই এমনিই।

লোকটা হঠাৎ গলাটা একটু নামিয়ে বলল, আমি বলি বাপু, কেটে পড়ো। এসব আমরা দখল পেয়ে গেছি। এখন সব দেখাশোনা আমরাই করব। এটা এখন আমাদের বাড়ি। বুঝলে!

নিরাপদ ঘাড় হেলিয়ে বলল, বুঝেছি। তা এই বেলাটা—

শশব্যস্ত লোকটা বলল, না না, ওসব হবে না। অন্য জায়গায় দেখ। আমার পরিবার-টরিবার সব আজ সকালেই এসে পড়ছে। মেলা লোক বাপু। ঘরদুয়োর সাফসুতরো করা, গোছানো, মেলা কাজ আমাদের। আজ অতিথিসেবা পেরে উঠব না। এখন এসো গিয়ে।

অগতির গতি নেলো আছে। তার বাড়ি গিয়ে পড়লে ফেলবে না। সকালে তার শ্বশুরবাড়িতে মুড়ি খেয়েছিল বাতাসা দিয়ে। তা তল হয়ে গেছে। এখন তার পেটে বাঘের খিদে। নেলোর বাড়িতে চাট্টি জুটলে খেয়েদেয়ে ফেরতযাত্রায় রওনা হয়ে পড়া যাবে।

কাহিল শুকনো মুখেই ফিরেই যাচ্ছিল, এমন সময় বেঁটেখাটো কালো

চেহারার এক মহিলা ফটক ঠেলে ঢুকল এসে। তাকে দেখে বলল, কে গো বাছা তুমি? কী মতলব?

নিরাপদ ব্যাজার মুখে বলল, কে আর হবো? উটকো লোক বলেই ধরে নিন। এরকম কুকুর-তাড়া জীবনে খাইনি।

মেয়েছেলেটার হাতে গোটা দুই ঠোঙায় বোদহয় মুদির দোকানের জিনিস। একটু নরম গলায় বলল, আসছো কোত্থেকে? স্যান্ডেলের বিল নাকি? নেলো বলেছিল বটে মাসিমার ভাইপো আসবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিরাপদ বলল, আমিই। তা ধুলো পায়েই চলে যেতে হচ্ছে। উনি মোটে ঢুকতেই দিলেন না। আপনি কি মোক্ষদা দিদি?

ঢুকতে দেয়নি? বলে মোক্ষদা চোখ পাকিয়ে বলল, ঢুকতে দেয়নি কেন? মৌরসীপাট্টা নাকি?

তা উনিই জানেন।

রোসো বাছা। তোমাকে চিনি। এতটুকুন দেখেছি। ওরাও যে, তুমিও সে। কে কাকে ঢুকতে না দিয়ে পারে?

নিরাপদ দাঁড়াল।

মোক্ষদা সটান গিয়ে লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ভেবেছোটা কী অ্যাঁ? বলি এ বাড়ি কি তোমার বাবার? মাসির সম্পত্তি এখনও মাসিরই আছে। তুমি তার ভাইপোকে তাড়াও কোন সুবাদে?

লোকটা একটু ভড়কে গিয়ে বলল, দ্যাখ মোক্ষদা, মুখ সামলে!

মোক্ষদাকে চোখ রাঙাচ্ছ? আমার একটা ডাকে শতেক লোক জড়ো হবে জানো? এ বাড়িঘর কার তার বিচার এখনও হয়নি। তুমি মাসির ভাসুরপো আছো তো থাক, আমি তো বারণ করিনি। আবার ছেলেটাও মাসির ভাইপো। ও-ও থাকবে। তুমি তাড়ানোর কে?

তুই আইন জানিস?

আইন জানার দরকার নেই। এটা জানি যে তোমাদের কারোই এখনও হক জন্মায়নি। বেশি তড়পাবে না।

নিরাপদর কানে মোক্ষদার কথাগুলো যেন মধু ঝরাচ্ছিল।

লোকটা দু-একবার হুংকার ছাড়ার চেষ্টা করে সুবিধে করতে পারল না। অবশেষে বলল, জায়গা কোথা? আমার বাড়ির সব আসছে।

মোক্ষদা বলল, তার আমি কি জানি? জায়গা না হলে হাটখোলায় নিয়ে তোলো গে। এ ছেলে ওই পুবের ঘরে থাকবে। ব্যবস্থা আমি করেই রেখেছি।

কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

কাজটা ঠিক হচ্ছে না। এ দাবি তোলবার মতলবে আসেনি তো আবার?

এলে এসেছে। গাঁয়ের পাঁচজনে বসে সব ঠিক করবে। তোমার অত সর্দারির দরকার কী? এসো তো ছেলে, ঘরে এসো।

নিরাপদ মাথাটা নিচু করেই বাড়িতে ঢুকে পড়ল। এই ঢুকে পড়াটা দুদিন আগে হলে সুবিধে হত।



॥ দুই ॥

পুবের ঘরের বাহারখানা বসে বসে দেখছিল নিরাপদ। পাকা বাড়ির রকমই আলাদা। একেবারে নিরেট জিনিস। একবার বানিয়ে ফেললে আর লয়ক্ষয় নেই। পুবের ঘর বলে আলো হাওযা আছে। দু খানা জানালা পুবে আর দক্ষিণে। ঘরে একখানা চৌকি, তাতে পাতলা তোশকের বিছানাও পাতা। আর কিছু নেই অবশ্য। চৌকির তলায় গোটা আষ্টেক কুমড়ো আর মুখবাঁধা বস্তায় বোধহয় নারকেলই হবে। সব দেখে নিয়েছে নিরাপদ। সে কুয়োর জলে স্নান করেছে, ধুতি-জামা ধুয়ে দিয়েছে। এখন আধভেজা লুঙ্গি পরে বসে আছে। মোক্ষদা একবার জিজ্ঞেস করেছিল সে চা খায় কি না। খায় জেনে চলে গেছে, আর আসেনি। এক পেয়ালা চা আর একটু মুড়ি টুড়ি জুটে গেলে পেটের তাড়সটা কমে।

পুবের ঘর মানে বাড়ির সামনের দিকে বাঁ-হাতি ঘর। সামনেই

বাগানখানা। ডান ধারে বারান্দা। বারান্দার লোকটা এখন আর নেই। একটু আগে ভিতরবাগে কোথায় যেন চলে গেল। লোকটাকে ভয় খাচ্ছে নিরাপদ। ও তরফের দাবি বেশি। দখল আগে নিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, পরিবারও এসে যাচ্ছে। লোকটা কেমন তা বুঝতে পারছে না সে। তবে তার যে আশা নেই এটা বেশ বুঝে গেছে। লোকটা খেঁকি ধরনের। কখন তেড়ে আসবে কে জানে?

একটু ঢুলুনি এসেছিল। মোক্ষদা এসে ডাকল, ও নিরাপদদাদা, ঘুমোলে নাকি?

না, এই একটু—

নেলো সব বলে গেছে এসে। আহা, খুব ঝঞ্ঝাট গেছে তো পথে!

এই নাও চা। মুড়িতে তেল মাখানো আছে। সঙ্গে এই শশা। মাসির নিজের হাতে লাগানো গাছের শশা খাও।

নিরাপদর ইচ্ছে হল মোক্ষদার পায়ের ধুলো নেয়। সেটা পারল না বটে, কিন্তু এমন বিগলিত ভাব করল যে এমন জামাই আদর তাকে কেউ কখনও করেনি।

মোক্ষদা শক্তপোক্ত মেয়েছেলে। চোখ-মুখ পুরুষালী ধাঁচের, বলল উনি তো পরশু এসে জুটলেন। এসেই হাঁক ডাক, হুকুম, যেন সাতপুরুষের জমিদারিতে এসেছেন। জন্মে দেখিনি, বলছে ভাসুর-পো।

আশায়-আশায় নিরাপদ বলে উঠল, দু নম্বরী নাকি?

কে কত নম্বরী তা কি আমার জানার কথা! তবে বাপের নাম সাধন দাস ঠিকঠাকই বলছে। সাধনবাবু আসতেনও আগে। মাসির কাছে নামও শুনেছি। কিন্তু এতকাল সম্পর্ক নেই, মরার পর কোন পাখির মুখে খবর পেয়ে উনি উড়ে এলেন কে জানে বাবা! গরু মরলে শকুন যেমন টের পায় তেমনি ব্যাপার। লোক মোটেই ভাল নয়।

মুড়ি আর শশা বড় চমৎকার লাগছিল নিরাপদর। শিশুর মত বিস্ময়ে বলল, বটে!

এসে অবধি আমার হাড়মাস জ্বালিয়ে খাচ্ছে।

সেটা কেমন?

এটা সেটা রাঁধতে বলে। খুব নোলা। তার ওপর জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার স্বভাব আছে। ঘরদোর আলমারি বাক্স, সব খোলার জন্য চাপাচাপি। আমি সাফ বলে দিয়েছি, ওসব হবে না। আমি জিম্মাদার। আমার হাতে যতক্ষণ ক্ষমতা আছে, যতক্ষণ না মালিকানা সাব্যস্ত হয়, ততক্ষণ কোনও জিনিসে হাত দিতে পারবে না। তাইতে বাবুর কী রাগ! তা থোড়াই ওর রাগকে আমি পরোয়া করি। ঝগড়া করতে চেষ্টা করেছিল, দিয়েছি পাঁচকথা শুনিয়ে। উনি আমাকে ঝি খাটাতে চেয়েছিলেন। প্রথম প্রথম ফাইফরমাস খেটেও দিচ্ছিলাম। কাল থেকে বন্ধ করেছি। খাও এখন নিজে রেঁধে।

নিরাপদ চায়ে একটা চুমুক মেরে বলল, একটা কথা দিদি, পিসির তো তুমি মেয়ের মতো ছিলে।

মেয়ের বেশি।

তা পিসি তোমার বন্দোবস্ত কী করে গেল?

মোক্ষদার মুখখানা একটু কেমন ধারা হয়ে গেল। পুরুষালী মুখখানায় যেন একটা কান্নার মেঘ ঘনিয়ে উঠল। কিন্তু কাঁদল না মোক্ষদা। কাঁদার মতো মানুষ নয়। একটু যেন অন্যরকম গলায় বলল, বন্দোবস্ত আর কিসের? যে বিষয়-সম্পত্তি পাবে তার দয়া।

কেন যেন কষ্ট হচ্ছিল নিরাপদর। মোক্ষদা যে পিসির জন্য জান বেটে দিত এটা সে জানে। মাথা নেড়ে বলল, এটা পিসির উচিত কাজ হয়নি, এ যা লোক, তোমাকে দেখবে বলে মনে হয় না।

মোক্ষদা একটা শ্বাস ফেলে বলল, না দেখুক। গতরে খাটতে পারি, অভাব কিসের? গদাই দাসের পা চাটবো নাকি?

এ লোকটার নাম কি গদাই?

হ্যাঁ গো, গদাধর দাস। নামের বাহার আছে খুব। কাল দুপুরে ঠেসে বোয়াল মাছ খেয়ে আজ পেট নেবেছে। ঘন ঘন পায়খানায় দৌড়োচ্ছে।

দেখ গে যাও। আমি সাফ বলে দিয়েছি, ওয়ারিশ ঠিক হয়ে গেলেই আমি বিদেয় হবো।

নিরাপদ কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, একটা কথা বলব দিদি?

বলো।

পিসির যা আছে সবই তো তোমার হাতে এখন। তা যা তোমার ন্যায্য পাওনা তা নগদানগদি নিয়ে নাও না কেন?

বলো কী? ও সব কাজ মোক্ষদার দ্বারা হওয়ার নয়। দিয়ে যখন যায়নি, তখন আমি নিজের হাতে নিতে যাবো কোন দুঃখে!

দেওয়ার ইচ্ছে হয়তো ছিল, সময় পায়নি।

তা বড় মন্দ বলোনি। মাসির ইচ্ছে তো ছিলই। কী বলত জানো? শুনলে হাসবে, বলত আমি মরলে সব তুই পাবি।

বলত?

সে অবশ্য কথার কথা। দেশে আইন-আদালত আছে, দিলেই তো আর হল না। আর আমারই বা দরকারটা কিসের? একটা তো মোটে পেট। চলে যাবে।

তোমার আর কেউ নেই?

কে থাকবে? নোনাইয়ে বাড়ি ছিল। মাসির কাছে এসেছিলাম তো টুকুন বয়সে। বাবা খেতে দিতে পারত না, তাই মাসিকে গচ্ছিত করে গেল। তা বাবা নেই। মা গেল বছর গত হয়েছে। একটা ভাই আছে, পরের জমি চাষ করে পেট চালায়।

তাহলে তুমি যাবে কোথায় দিদি?

কোনও চুলোয় যাবো।

মোক্ষদা আর দাঁড়াল না। চা আর মুড়ি শেষ করে নিরাপদ উঠল। কুয়োর ধারে গিয়ে জল তুলে কাপ আর বাটি ভাল করে মাটি দিয়ে মেজে ধুয়ে রান্নাঘরের চৌকাটের পাশে রেখে দিয়ে এল।

ফিরে আসার সময়ে গদাইয়ের সঙ্গে মুখোমুখি।

তিরিক্ষে লোকটা তাকে দেখেই যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল,

ঘরটা যে বড় দখল করলে, আমার ইয়েরা এসে থাকবে কোথায় বলতে পারো? মোক্ষদা মাগী তো দুখানার বেশি ঘর খুলবে না। তারও একটা তুমি গাপ করলে। আমার সাতজন, আমাকে নিয়ে।

নিরাপদও যেন সমস্যাটা বুঝল, মাথা নেড়ে বলল, ঠিকই তো।

তুমি কি রাত কাটাতে চাও নাকি?

জায়গা না হলে চলেও যেতে পারি।

সে তোমার বিবেচনা, কাকিমা কবে থেকে চিঠি লিখছে, বেঁচে থাকতে থাকতে আয় বাবা, সব বেহাত হওয়ার আগেই তোর হাতে সঁপে দিয়ে যাই। তা সংসারী মানুষ, খেটে খেতে হয়, হুট বলেই তো আসা যায় না। যাবো-যাচ্ছি করে করে এই আসা। তা এসে তো খুব শিক্ষা হল। এটা আছে তো ওটা নেই, ঘরে ঘরে তালা, আর ওই মাগীর যেন আঁতে আগুন লেগেছে। এত ঝঞ্ঝাট জানলে কে আসত বাবা! আঁটপুরে আমার কিসের অভাব? দোতলা বাড়ি, জমিজিরেত, গাই গরু, ফলাও সংসার। কাকিমার স্মৃতি জড়িয়ে আছে বলে আসা। তাঁর শেষ ইচ্ছে। নইলে দশ ভূতে লুটে পুটে খাবে।

আঁটপুরে বাড়ি বুঝি আপনার?

তিন পুরুষের বাস। পরগনার সবাই এক ডাকে চেনে।

আপনি ভাববেন না। রাতে আমি বরং বারান্দাতেই কিছু একটা পেতে শুতে পারবখন। বাঁধানো জায়গা, অসুবিধে হবে না।

লোকটা যেন একথায় খুশি হল না। অথচ হওয়ার কথা। কেমন একটা মনমরা মুখ করে বলল, কষ্ট করবে কেন ভায়া? বাড়ির ছেলে বাড়িতে ফিরে গেলেই তো হয়। দূরে নাকি?

আজ্ঞে না। তেমন দূর নয়। তবে বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চল তো জানেন, সব যেন দূরে দূরে সরে যায়।

আমাদের আঁটপুর তেমন নয়। পাকা রাস্তা, জলকাদার অত্যাচার নেই। এই অখদ্দে জায়গায় আমাদের কি পোষাই? এ সব বেচেবুচেই দিতে হবে বোধহয়। দাম অবশ্য উঠবে না।

কমও হবে না। এটা এ অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু গাঁ।

তা বটে। দেখি। তাহলে তুমি কী করছো?

কাল সকালেই বিদেয় হবো।

তার আর কী করা! বারান্দা কিছু খারাপ জায়গা নয়। বেশ থাকতে পারবে।

লোকটার সঙ্গে আর কথা হল না। রান্নার জোগাড় দেখি গে যাই বলে লোকটা ভিতরবাড়ির দিকে গেল।

পাকা দালানে মোট চারখানা ঘর, দুটো বারান্দা, উঠোনের ওপাশে রান্নাঘর। আরও পিছনে স্যানিটারি পায়খানা। বাঁধানো কুয়োতলা। সব বেশ তকতকে। পিসির শুচিবায়ু ছিল। বাঁ ধারের দুখানা ঘর বন্ধ, চাবি মোক্ষদার আঁচলে। একখানা ঘরে মোক্ষদা রাতে শোয়। বাইরের লোককে চৌকাট ডিঙোতে দেয় না। নগদে আর সোনাদানায় পিসির যা ছিল সব ওই দুটো ঘরে লোহার আলমারিতে।

নিরাপদ ঘুরে ঘুরে একটু দেখল। লোভটা মরে গেছে। ও বাড়িঘর তার নয়! গদাই দাসের। এটা জানার পর মনটা খারাপ হলেও হালকা লাগছে। তার যখন নয় তখন আর ভেবে কী হবে?

বেলা বিশেষ হয়নি এখনও। এগারোটা হবে, সে গাঁ-খানা ঘুরে দেখতে বেরোলো। বেরিয়ে একটা বিপদ। সবাই তাকায়। দু একজন বেশ কূট চোখেও তাকাচ্ছে। শীতলা মন্দিরের কাছে একজন ভারিক্কি চালের মানুষ ফস করে জিজ্ঞেস করল, কোত্থেকে আগমন হচ্ছে?

আজ্ঞে, স্যান্ডালের বিল।

সে তো ওই দক্ষিণে?

যে আজ্ঞে।

তা এখানে কার বাড়িতে?

পিসি। মারা গেলেন।

অ। সম্পত্তির ব্যাপার?

একটু রাগ হল শুনে, বলল, না আমি ওয়ারিশ নই। এমনই আসা।

খালধারটা বেশ ভাল। চাওড়া খাল। ইছামতীর সঙ্গে যোগ। ভরা বর্ষায় ফুলে ফেঁপে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পারঘাট আছে। হাসনাবাদ থেকে এদিক দিয়ে নৌকো বা ভটভটিতে আসা যায়। আসছেও লোক, যাচ্ছেও। অশত্থ গাছের তলায় একাবোকা বসে নিরাপদ এই গতায়াত দেখল কিছুক্ষণ।

দেখতে দেখতে হঠাৎ একটু টান হয়ে বসল। একটা ভটভটি এসে থেমেছে। পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে এক মেয়েমানুষ নামল। তার পরনে ময়লা ডুরে শাড়ি। সঙ্গে গোটা পাঁচেক ছেলেমেয়ে। খুব কলকল করে কথা কইছে তারা। ঘাটে উঠে একটা বছর দশেকের ছেলে জিজ্ঞেস করল, ও মা, এবার কোন দিকে যাবো?

দাঁড়া, জিজ্ঞেস করতে হবে। ও ছেলে, বিন্দুবাসিনী দাসীর বাড়ি কোন দিকে জানো?

তাকেই জিজ্ঞেস করছে। এই কি তবে গদায়ইয়ের পরিবার? তাই হবে মনে হচ্ছে। নিরাপদ বলল, গদাধরবাবুর কেউ হন আপনার?

আমরা তারই বাড়ির লোক। এ সব তার ছেলেপুলে।

সোজা চলে যান। বটতলা থেকে বাঁ দিকে মোড় নেবেন। ডানহাতি পাকা বাড়ি। সবাই চেনে।

পাঁচ জন ছেলেমেয়ে। বড়টার বোধহয় ষোলো-সতেরো বছর বয়স হবে। ছোটটার মেরে কেটে তিন কি চার। তারা আগু হয়ে যাওয়ার পরে নিরাপদ উঠল। বেলা হয়েছে। তবে সটান এল না। একটু ঘুরে-ফিরে সময়টা খানিক কাটালো।

বটতলার কাছে নেলো ধরল, কী কাণ্ড বলুন তো!

কী হল?

গদাই বলে লোকটা যে গুষ্টিসুদ্ধু এনে ফেলল।

তাই দেখছি।

আপনার তাহলে আশা নেই?

নিরাপদ হেসে বলল, না গো। আইনের মেলা প্যাঁচ।

তাহলে কি ফিরেই যাবেন?

তাই ভাবছি। কাল সকালে ভটভটি ধরে হাসনাবাদ হয়ে যাব।

নেলো মাথা টাথা চুলকে বলল, মোক্ষদাদিদি তো রেগে একেবারে কাঁইবিচি হয়ে আছে। গদাই নাকি তাকে বড়ই খাটায়। আমি বলি কি, একবার সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা করে যান।

তিনি কে?

পলাশডাঙ্গা স্কুলের মাস্টার। পাকা মাথা। সবাই বিপদে পড়লে তাঁর পরামর্শ নেয়।

আমার আবার বিপদ কিসের?

বিপদ নয়? আপনি বড্ড ছেলেমানুষ।

নিরাপদ একটা শ্বাস ফেলে বলে, বুঝলে নেলো, আমার তেমন দুঃখ হচ্ছে না। বরং হালকাই লাগছে। তবে সম্পত্তি যদি পেতাম তবে মোক্ষদাদিদির জন্য পাকা বরাদ্দ করে দিতাম। মানুষটা কিছু পেল না।

সে কথাও খাঁটি, তবে ও নিয়ে ভাববেন না। দিদির কাজ বাঁধা। লক্ষ্মণ মণ্ডলের আড়তে তার কাজ ঠিক হয়ে আছে। তবে সে পলাশডাঙায়।

কাজের কথা বলছো? চিরকাল কাজ করেই খেতে পারে নাকি মানুষ? বয়স হচ্ছে না?

ও নিয়ে ভাববেন না। বিন্দু পিসির চেয়ে খারাপ রাখবে না লক্ষ্মণ মণ্ডল। তার বিরাট অবস্থা।

সুধীরবাবুরও পাকা বাড়ি। তবে ছাদ নয়, টিনের চাল। যেতেই সুধীরবাবু বেরিয়ে এলেন। ফর্সা চেহারা। লম্বা আর রোগা। বয়স ষাটের গোড়ায়।

নেলো বলল, ইনিই বিন্দু পিসির ভাইপো।

সুধীরবাবুর চোখ দুখানা বিচক্ষণ। একবার মেপে নিয়েই বললেন, তা বাবা, কাজটা শক্ত হবে।

নিরাপদ বলল, কিসের কাজ?

এই স্বত্ব স্বামীত্ব দাখিল করা। সাকসেশন বের করাও শক্ত কাজ।

দরখাস্ত করে বসে থাকলেই হবে না, ছোটাছুটি, টাকা খাওয়ানো। ততদিনে—

সে সব আর দরকার নেই। আমার দাবি উঠছে না।

তবে কার দাবি?

নেলো বলল, পিসির ভাসুরপো এসেছে। গদাধর দাস।

তাই নাকি? তবে মুশকিল আছে।

নেলো বলল, ইনি খয়রাতি করে দিতে চাইছেন। সম্পত্তি নেবেন না।

না না, হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ভাসুরপোরও হ্যাপা আছে। ব্যাপার সহজ নয়।

এসব কথা আর ভাল লাগছে না নিরাপদর। ভ্যাজরং ভ্যাজরং করে লাভটা কী হচ্ছে? সে বলল, উনিই নিন। ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট আমার পোষাবে না।

সুধীরবাবু আর নেলোতে একটু তাকাতাকি হল। সুধীরবাবু বললেন, তা লোভ টোভ না থাকা ভাল। তবে কি না হুট করে কিছু ঠিক করতে নেই। একটু রয়ে সয়ে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এখন চেপে বসে থাকো কদিন।

আমি যে কালই ফিরে যাবো।

পাগল নাকি! এসে যখন পড়েছো খেলটা দেখেই যাও।

উনি যে থাকতে দিচ্ছেন না। ঘরেরও টানাটানি। ওঁর পাঁচ ছেলেমেয়ে আর বউও এই এসে পড়ল। থাকবো কোথায়? আজ রাতটা বারান্দায় কাটিয়ে কোনওমতে কাল সকালেই ভটভটি ধরছি।

এঃ, তুমি যে একেবারে আহাম্মক দেখছি। অত বৈরাগী হয়ে সংসারে থাকা চলে না হে। শক্তপোক্ত হও। নির্লোভ হওয়া ভাল, তা বলে আহাম্মক হবে কেন? ফেরার মতলব ছাড়ো, তোমাকে এখন থাকতে হচ্ছে বাপু।

কেন থাকতে হচ্ছে তা আর সুধীরবাবু ভেঙে বললেন না। কিন্তু

এমনভাবে বললেন যে নিরাপদ আর গাঁইগুঁই করল না। বিদায় নিয়ে যখন চলে আসছে তখন নোলোও সঙ্গে। বলল, এ গাঁয়ে নানা প্যাঁচের লোক থাকে। কেউ, জিলিপির প্যাঁচ, কেউ অমৃতির প্যাঁচ, কেউ ঘুড়ির প্যাঁচ তো কেউ লাট্টুর প্যাঁচ। বুঝতে সময় লাগবে। ভামির জলা পার করিয়ে এত কষ্টে আপনাকে নিয়ে এলুম, সে কি এমনি? প্যাঁচ আছে।

কিন্তু আমি যে ভয় খাচ্ছি।

ভয়টা কিসের?

লোকটা বড় তিরিক্ষি মেজাজের।

উলটে আপনিও মেজাজ দেখান না। দেখবেন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বেশ দুরুদুরু বুকেই বাড়ি ফিরল নিরাপদ। গদাই দাস বাড়ি দখল করে আছে। শোওয়া-বসারও সুবিধে হবে না। তার ওপর অতগুলো ছেলেপুলের উৎপাত।

ফটক থেকেই সে মোক্ষদার গলা শুনতে পেল। বেশ উঁচু গলা।

বলেছিল, পুবের ঘর নেবে মানে? মগের মুলুক নাকি? ছোঁড়াটা কোথায় থাকবে তাহলে শুনি?

গদাই চেঁচাল না, কী যেন আস্তে করে বলল।

কিন্তু মোক্ষদার গলা সপ্তমে উঠল, বারান্দায় থাকবে? এই বর্ষা-বাদলায় বারান্দায় থাকবে ছোঁড়াটা? আর তুমি দিব্যি বউ-বাচ্চা নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে শোবে? তোমার গায়ে মানুষের চামড়া না কী? অ্যাঁ! পাষণ্ড বললে তোমাকেই বলতে হয়। ছোঁড়াটা বোকাসোকা ভিতু বলে তাকে অত্যাচার করবে? মোক্ষদা থাকতে তা হবে না, থাকতে চাও তো ওই একখানা ঘরেই থাকবে। বউ-বাচ্চা আনতে তোমাকে কে বলেছিল?

নিরাপদ প্রমাদ গুনল। ঝগড়াঝাঁটি তার সয় না, ভয়ও খায়।

ঘরে না উঠে সে একটা জবা-গাছের আড়ালে একটু দাঁড়িয়ে রইল, ওদের ঝগড়া থামলে যাবে।

ঝগড়াটা অবশ্য বেশিক্ষণ চলল না, গদাই দাসের বউ বোধহয় তেমন

ঝগড়াটি নয়। তার গলা শোনা গেল না। একটু বাদে দেখতে পেল গদাই দাস বারান্দায় বেরিয়ে এসে একটা বিড়ি ধরাল। মুখখানা থমথমে। ছোটো বাচ্চাটা বোধহয় বাপের কাছে বায়না করতে এসেছিল, তাকে দু ঘা বসিয়ে দিতেই সেটা চেঁচাতে চেঁতাতে ভিতর বাগে গেল। গতিক সুবিধের ঠেকল না তার কাছে।

একটা দাঁড়াস সাপকে ট্যাড়সখেতে ঢুকতে দেখে আর দাঁড়াতে ইচ্ছে হল না নিরাপদর। আড়াল ছেড়ে প্রকাশ হল। আর হতেই বিপত্তি। গদাই দাস তাকে দেখেই বিড়িটা ফেলে দিয়ে বলল, এই যে বাপু, খুব তো ভালমানুষী দেখিয়ে সরে পড়লে। এদিকে তলায় তলায় অন্য ব্যবস্থা, অ্যাঁ? তখন থেকে বলছি, বাপু, এসব আমার বাড়িঘর, এতে তোমার কোনও অংশ নেই, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। তবু কোন মতলবে গেড়ে বসতে চাইছো বলো তো! মোক্ষদার সঙ্গে সাঁট আছে নাকি?

নিরাপদ হাফসানো গলায় বলল, আজ্ঞে না।

শোনো বাপু, আঁটপুর ছেড়ে এতদূর এসেছি তোমাদের বেয়াদবি সহ্য করতে নয়। এখানে তোমার সুবিধে হবে না। দয়া করে কেটে পড়ো।

নিরাপদ বলল, তাই তো চাইছিলাম। কিন্তু—

কিন্তু? কিন্তু আবার কিসের? বলছি তো, তোমার এখানে আসাটাই ভুল হয়েছে। বুঝতে চাইছো না কেন?

কথা আর গড়ানোর আগেই ডুরে শাড়ি পরা বউ মানুষটি বেরিয়ে এল। মাথায় ঘোমটা। গদাইয়ের কাছাকাছি গিয়ে কী যেন চাপা গলায় বলল।

গদাই তাতে খুশি হল না। বলল, হবে বললেই হয় কখনও? ও ঘরে সাতটি মানুষ। গাদাগাদি হবে না?

বউটি বলল, কিছু অসুবিধে নেই। ঘর বড় আছে।

আরে না। বড় বললেই বড়! তাছাড়া আর একখানা ঘর যখন আছেই তখন মিছিমিছি কষ্ট করতে যাবো কেন? আমারই তো সব।

বউটি বলল, আহা, থাক না। বারান্দায় এই বর্ষাকালে থাকলে ঠাণ্ডা

লাগবে। সাপখোপ উঠে আসে। ওরকম কোরো না।

গদাই গম্ভীর হল। খুশি হল না। বলল, এভাবে দখল হয় না, বুঝলে! শক্ত থাকতে হয়।

নিরাপদ প্রায় চোরের মতো বারান্দায় উঠে তার ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই এক গাল মাছি। দুটো দশ বারো বছরের ছেলে আর মেয়ে মেঝেতে বসে খেলনাবাটি নিয়ে খেলছে। তাকে দেখে একটু অবাক হয়ে তাকাল। ইতিমধ্যে মেঝের ওপর মাটি মেখে নোংরা করেছে। বিছানাতে ময়লা হাতের ছাপ।

নিরাপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, পারা যাবে না।

নেলো, মোক্ষদাদিদি, সুধীরবাবু যতই ভরসা দিক, নিরাপদ কিছুতেই গদাই দাসের সঙ্গে পেরে উঠবে না। কারণ, এটা গণতন্ত্রের যুগ। সেদিক দিয়ে গদাইয়েরই জয়জয়কার। বিছানার একটা কোণে চুপ করে বসে বাচ্চা দুটোর খেলার দিকে একটু চেপে রইল নিরাপদ। ধুলোবালি, গাছের পাতা, পাথরকুচি আর জল দিয়ে কী খেলছে কে জানে।

তার দিকে চেয়ে বউটি বলল, তুমি ভাই এ ঘরেই থেকো। আমাদের ও ঘরে হয়ে যাবে।

আজ্ঞে।

তোমার বাড়ি কোথায়?

সেই স্যান্ডেলের বিল। চিনবেন না। লাট অঞ্চল।

না ভাই, আমরা এ জায়গা চিনি না। বাড়িতে কে কে আছে?

মা আছে, দুটো ভাই।

কী করো?

করব আর কী? কাজ কোথায়? বাচ্চা কাচ্চা পড়াই।

তাইতেই হয়?

মাথা নাড়ল নিরাপদ, না, হয় না।

বউটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, উনি তো আঁটপুরের বাস উঠিয়ে চলেই এলেন। এখন কী হয় কে জানে!

কেন, ভালই হবে। পিসির সম্পত্তি কিছু কম নয়। দেখেশুনে রাখতে পারলে অভাব হবে না কিছু।

কি জানি ভাই, কী সব গণ্ডগোল শুনি।

তা আছে। আইন নাকি খুব প্যাঁচালো। তবে রয়ে সয়ে হয়ে যাবে।

কি জানি ভাই, চলে তো এলুম। এসব জায়গা কেমন তা জানি না।

সাপখোপ পাবেন, জোঁক আছে।

তা সে আঁটপুরেও আছে। গাঁয়ে থাকি সে ভয় নেই। এখানকার লোকজন কেমন তা কে জানে!

সেও ওই আঁটপুরের মতোই হবে। ও নিয়ে ভাববেন না।

হ্যাঁ ভাই, বিন্দু কাকিমা কি তোমার আপন পিসি?

হ্যাঁ।

মোক্ষদাদিদি তাঁর কাজের লোক?

তাও বলা যায়। সম্পর্কটা ওরকম ছিল না। পিসির মেয়ের মতো।

তাই অত তেজ। আসি ভাই, রান্নাবান্না চাপাতে হবে। যা রাস্তায় হয়রানি।

বউটা চলে গেল।

দুপুরে রান্নাটা হল দু তরফে। পাকা রান্নাঘর মোক্ষদার দখলে। সেখানে রান্না চাপাল মোক্ষদা, নেলো আর নিরাপদর জন্য। গদাইয়ের বউ ভিতরের বারান্দায় তোলা উনুনে ও-তরফের রান্না করতে বসল। খাওয়াটাও হল আলাদা, রান্নাঘরে আর বারান্দায়।

খেতে দিয়ে মোক্ষদা চাপা গলায় বলল, রাবণের গুষ্টি খাচ্ছে দেখ! এ যা খোরাক দেখছি, দু দিনে সংসার ছারেখারে যাবে।

কথাটা গদাইয়ের পরিবারকে উদ্দেশ করে বলা। নিরাপদ নীরব রইল।

নেলো বলল, খাচ্ছে খাক, ক'দিন আর?

মোক্ষদা শ্বাস ফেলে বলল, পাত্তরটি সোজা নয়।

অত ভেবো না দিদি। ব্যবস্থা হচ্ছে।

নিরাপদ এসব কথার মধ্যে নেই। বাইরের লোক সে। তার কী দরকার

এসব গুহ্য কথার মধ্যে যাওয়ার।

খেয়ে ঘরে এসে সবে বসেছে, কোত্থেকে একটা ডবকা ছুঁড়ি এসে মিহিন সুরে জিজ্ঞেস করল, আপনি পান খাবেন? মা জিজ্ঞেস করে পাঠাল।

না তো। আমি পান খাই না।

আচ্ছা, বলে মেয়েটা চলে গেল।



একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল নিরাপদ। সেই সময়ে মেঘ করে তুমুল বৃষ্টি। ঘন ঘন বাজ পড়ছিল কাছে পিঠে। নিরাপদর ঘুম সহজে ভাঙার নয়। কিন্তু একটা বাজ একেবারে যেন পাশ ঘেঁষেই পড়ল, আর গদাই দাসের ছেলেপুলেরা এমন চেঁচামেচি শুরু করেদিল যে নিরাপদ উঠে বসল। দেখল তার চৌকির ধারের দুটো জানালা বন্ধ। পায়ের দিককার জানালাটাও বন্ধ করছে গদাই দাসের বউ। সে উঠে বসায় লজ্জা পেয়ে বলল, ছাঁট আসছিল বলে বন্ধ করছি।

ও, খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হ্যাঁ, নাকও ডাকছিল একটু একটু।

লজ্জা পেয়ে নিরাপদ বলল, আমার নাক ডাকে বুঝি?

জানালা বন্ধ করায় ঘরটা বড্ড আবছা হয়ে গেল। বউটি বলল, আচ্ছা,

এখানে গরুর দুধ পাওয়া যায়?

কেন যাবে না? পিসিরই তো দুটো দুধেল গাই।

ও বাবা! মোক্ষদাকে দুধের কথা বলায় এমন মুখ করল। সব দুধের নাকি গাহেক আছে। এক ফোঁটাও বাড়তি নেই। কী যে করি। আমার ছোটটির তো দুধই ভরসা। এখানে কিনতে পাওয়া যায় না?

তা নিশ্চয়ই যায়। নেলোকে একবার জিজ্ঞেস করবেন।

তার তো পাশের গাঁয়ে বাড়ি। একবেলা কাজ করে খেয়ে চলে যায়। বিকেলে তো আসে না শুনলাম। এই বৃষ্টিতে অবশ্য দুধের আশাও নেই! কিন্তু আজ বলে রাখলে কাল সকালটায় অন্তত পাওয়া যেত।

গদাইবাবুকে বলুন না। উনি তো কদিন ধরে এখানে আছে। জানেন বোধহয়।

বলেছি। উনিও কেমন যেন উগ্রচণ্ডী হয়ে আছেন। কিছু বলতে ভরসা হয় না।

কেন, উগ্রচণ্ডী হয়ে আছেন কেন?

অনেক আশা নিয়ে এসেছেন তো। এখন শুনছেন অনেক গোলমাল। গাঁয়ের মোড়ল মাতব্বরদের নাকি টাকা-পয়সা খাওয়াতে হবে। আমাদের অবস্থা তো ভাল নয়।

তাই নাকি? কিন্তু গদাইবাবু যেন বলছিলেন, আঁটপুরে ওদের অনেক জায়গাজমি আর সম্পত্তি।

উনি ওইরকমই বলেন। ঘোরের রাজ্যে বাস করেন তো। না ভাই, আমরা খুব — কী বলব — গরিবই বলতে পারো। বিষ্ণুবাবুর ভরসাতেই আসা। এখন কী হয় কে জানে!

বিষ্ণুবাবুটা কে?

এই গাঁয়ের মস্ত মানুষ। গাঁয়ের মাথা। সবাই মানে।

তাহলে চিন্তা কিসের? বিষ্ণুবাবু ভরসা দিয়ে থাকলে তো হয়েই গেল।

না ভাই। অনেক নাকি ফ্যাঁকড়া আছে। আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, অত তো বলতে পারব না। তবে আছে।

দখল নিয়ে বসে থাকুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

দখল! তাও কি সোজা? মোক্ষদা তো ঝেঁটিয়ে তাড়াতে পারলে বাঁচে। ওকে বড্ড ভয় পাচ্ছি।

না না, মোক্ষদাদি ভাল মানুষ।

তা হয়তো হবে। আমাদের ওপর ভীষণ চটা। আমাদের উনিও তো ঠাণ্ডা মাথার মানুষ নন। তাই বনিবনা হচ্ছে না। এ তো আমাদের কাছে বিদেশ-বিভুঁই, তার ওপর যদি শত্রু তৈরি হয় তাহলে কি যে অশান্তি!

নিরাপদ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না বটে কিন্তু গদাই দাসের বউটিকে তার খারাপ লাগছিল না। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। রোগাভোগা মানুষ। চেহারায় তেমন শ্রী না থাক, মনটি বোধহয় ভাল। বউটা বলল, তুমি কি চা খাও ভাই?

তা খাই।

আমার খুব চায়ের নেশা। একটু চা করে আনি?

আপনি আমার জন্য চা করবেন? গদাইবাবু রেগে যাবেন হয়তো!

বউটি হাসল, ওঁর রাগকে ভয় পেলে কি আমার চলে? আসলে কি জানো, উনি ভীষণ ভীতু মানুষ, অল্পেই ভয় খান তো, তাই রেগেও ওঠেন। তবে উনি এখন বাড়ি নেই। বৃষ্টির আগেই কোথায় যেন বেরোলেন।

মোক্ষদাদিদিও চা করবে। তবু আপনিও করুন। যা বৃষ্টি, চা খারাপ লাগবে না।

বউটা যেন খুশি হয়েই চলে গেল। একটু বাদে চা নিয়ে এল সেই মেয়েটি, মেয়েদের একটু লজ্জা পায় নিরাপদ। হাত বাড়িয়ে কাপটা নিল, কিছু বলল না। মেয়েটা বলল, বিস্কুট দেবো?

না। তার দরকার নেই।

আমাদের কাছে আছে কিন্তু।

লাগবে না।

চালভাজা?

না থাক, আমার খিদেও নেই।

মেয়েটা চলে গেল। পনেরো-ষোলো বছর বয়স হবে। সকালে ফ্রক পরে ছিল, তত বড় দেখায়নি। এ বেলায় শাড়ি পরায় বড় বড় দেখাচ্ছে। ডাগর বাড়ন্ত চেহারা, ভাল করে না তাকালেও বোঝা যায়।

চাটি বেশ যত্ন করে করা। জিবে ভাল লাগছিল নিরাপদর। চা শেষ করার পর মেয়েটা এসে এঁটো কাপ নিয়ে যাচ্ছিল। নিরাপদ বলল, আমি ধুয়ে দিচ্ছি।

না না। আমরা ধুয়ে নিতে পারব।

এই যত্ন আত্তি আর খাতিরটুকু ভালই, যদি না পিছনে অন্য মতলব থাকে। কর্তা খার হয়ে আছেন, গিন্নি গদগদ। এর মধ্যে একটা প্যাঁচ থাকতে পারে। খুব প্যাঁচেই পড়েছে বটে নিরাপদ।

ভালই নেমেছে। ঘরবাড়ি যেন ভেঙে ফেলছে বৃষ্টির তোড়। পাকা বাড়ি বলে তেমন বোঝা যাচ্ছে না, টিনের চাল হলে শব্দে মালুম দিত। তবে পাশের বাড়ির চালেই টিন। সেখানে একেবারে খোল করতালের শব্দ উঠছে। চারদিক ঝাপসা। ট্যাড়সের খেতে দেখ-না-দেখ জল দাঁড়িয়ে গেল।

বউটা একটা বাটির মতো কিছু আঁচলে আড়াল করে এদিকেই আসবে বলে ঘর থেকে বেরিয়েছিল। হঠাৎ ওদিককার ঘরের দরজা খুলে মোক্ষদা উদয় হল। হাতে চা। বউটা পিছিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

মোক্ষদা এসে বলল, এই বৃষ্টি এখন নাগাড়ে চলবে। রাতে খিচুড়ি খেও।

চা-টা নিয়ে নিরাপদ বলল, আমার একটা হলেই হয়।

টাকাপয়সা সঙ্গে আছে কিছু?

আছে সামান্য।

এখন তো আর তোমাকে খরচ করে খেতে হবে না, সে ভয় নেই। তবে কয়েকদিন থাকতে হবে তো, হাতখরচের ব্যাপার আছে।

ও নিয়ে ভেবো না মোক্ষদাদিদি। আমার বিড়ির নেশা নেই। অন্য যা আছে তা শখের ব্যাপার, না হলেও ক্ষতি নেই।

মোক্ষদা তলিয়ে বুঝল না। বলল, গদাইবাবু তো হাতখানা পেতেই আছেন। কাল রাতেও বায়না ধরেছিলেন, পঞ্চাশটা নারকোল বেচে দিয়ে আসবেন কোন ব্যাপারিকে। আমি সাফ বলে দিয়েছি, ওয়ারিশ ঠিক না হয়ে কুটোগাছটিতে হাত দেওয়া চলবে না। কিছুক্ষণ তড়পাল, তারপর চুপ মারল।

হয়তো অভাবী লোক।

অভাবী এক, হা-ঘরে আর এক। এ হল হা-ঘরে।

বউটা বোধহয় খারাপ নয়।

তা কে দেখতে গেছে। এক ঝাড়েরই বাঁশ।

মুখরা নয় তো!

কী করে বলি! মুখনাড়া তো খাইনি এখনও। ছেলেপুলেগুলো তো রাক্ষস। দুপুরে সব কটা পেট টাই টাই করে খেয়ে উঠেছে, তারপর দেখি দু তিনটে গিয়ে খেত থেকে কাঁচা ট্যাড়স তুলে তাই খাচ্ছে। পেট তো নয়, যেন দামোদর।

নাঃ, তুমি বড্ড চটে আছো ওদের ওপর।

চটবো না তো কি? এণ্ডি গেণ্ডি এনে তুলেছে, বাড়িঘর সব নোংরা করবে!

তুলনামূলক বিচার করে নিরাপদ বুঝল, মোক্ষদার চেয়ে গদাই দাসের বউ চা ভাল করে। সেটা অবশ্য প্রকাশ করল না সে। শুধু বলল, গদাইয়ের বউ চা করে খাইয়েছে কিন্তু, মোক্ষদাদিদি।

মোক্ষদার গালে হাত, বলো কী? সব্বোনেশে কথা। আর দিলে খেও না।

নিরাপদ অবাক হয়ে বলে, কেন গো মোক্ষদাদিদি?

তুমি হলে শত্রুপক্ষ। ওদেরটা খেতে আছে? বিষ মিশিয়ে দেবে।

যাঃ।

যাঃ, নয় বাপু। গদাইয়ের মাথায় খুন চেপেছে তোমাকে দেখে। কেমন লাফালাফি করছে দেখেছো না। ওর আঁতে এখন বিছুটির জ্বালা। মুখের

গ্রাসের ভাগীদার জুটেছে তো!

আমি আবার কিসের ভাগীদার? বলেই তো দিয়েছি, আমার দাবি নেই।

সে তুমি বললেই তো হল না। আইনে কী বলেছে দেখতে হবে।

আচ্ছা মোক্ষদাদিদি, বিষ্ণুবাবু লোকটা কে?

সে আছে। মস্ত মাতব্বর। মাসিমার তিন বিঘা ধানজমি তো সেই দু'বছর আগে গাপ করল। খুব ধড়িবাজ লোক। তার কথা কেন?

সে-ই নাকি গদাইয়ের মুরুব্বি।

সবাই তাই জানে। বিষ্ণুর শ্বশুরবাড়িও আঁটপুরে কি না। তলেতলে যত মকরধ্বজ। তুমি এঁটে বসে থাকো।

বিষ্ণুবাবু যদি মাতব্বর হয়ে থাকে তবে আমার আর আশা কী বলো!

যা বলছি তাই করবে। তোমার অত নিকেশের দরকার কী? বাবারও বাবা আছে। দেখ না মজা।

মজা মোটেই দেখছে না নিরাপদ। বড্ড নড়বড়ে অবস্থা। কোথাকার জল কোথায় গড়ায় কে জানে। মোটের ওপর তার বড় অস্বস্তি হচ্ছে।

মোক্ষদা চলে গেল। বৃষ্টির বিরাম নেই। নাগাড়ে হয়েই চলেছে। বিকেলেই যেন অন্ধকার চাপ বেঁধে উঠল। মোক্ষদা একখানা হ্যারিকেন জ্বেলে একটা বাচ্চা মেয়ের হাত দিয়ে পাঠাল। তা ফাই-ফরমাশ খাটার লোকই হবে মেয়েটা।

নিরাপদ ফ্রক পরা বছর সাত-আট বয়সী মেয়েটাকে থুতনিতে নাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করল,তুমি কে গো?

পটলি।

কোথায় বাড়ি?

এই গাঁয়ে। রাখাল মণ্ডলের মেয়ে।

বেশ বেশ।

হ্যারিকেন না হলেও চলত। অন্ধকার ঘরেই বসে থাকতে পারত। হাতে তো কাজ নেই।

বউটা আবার এল। আঁচলের তলা থেকে একটা পেতলের বাটি বের

করে বলল, আমার নিজের হাতের চালভাজা। ফুটকড়াই মেশানো। তেল মেখে দিয়েছি। লঙ্কা আছে। খাও।

এসবের আবার কী দরকার ছিল?

এমনি। আঁটপুরে তো এইসব করে করে বিক্রি করতাম। মোয়া, নাড়ু, ডালের বড়ি। গঞ্জের ব্যাপারিরা নিয়ে যেত। কিছু এনেছি, যাতে এখানে এসেই অভাবে না পড়ি।

চাল ডালও কী এনেছেন?

না গো, আজ অবধি মোক্ষদাই দিয়েছে। তবে মুখ ব্যাজার। ফুলিকে নাকি বলেছে, এত লোকের যোগাতে পারবে না। শুধু দু জনের মতো দেবে।

তাহলে চলবে কী করে?

চলছে নাকি? কালই চাল-টাল আনাতে হবে। সংসার তো হাঁ করে আছে। সব গিলে খেতে চায়।

তাহলে তো আপনাদের বিপদই হল।

হ্যাঁ, এখানকার ব্যবস্থা ভাল দেখছি না। আঁটপুরে কত গল্প করে এলাম, এখন যদি ফিরে যেতে হয় তো কী লজ্জা বলো!

ফিরবেন কেন? থাকুন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

তুমিও কি থাকবে এখন?

কয়েকটা দিন আছি। তবে পাকাপাকি থাকার তো উপায় নেই। এ হল পিসির সম্পত্তি, আমার তো আর হক নেই তার ওপর। আপনারাও এসেই গেছেন।

ওমা! সে কী কথা? তোমার হক নেই কেন? আপন পিসি না?

তা বটে। পিসি আপন বলে সম্পত্তি তো আর আপন নয়। সম্পত্তি আপনাদের আপন।

আমি অত বুঝি না ভাই। তুমি আছো বলে বেশ লাগছে। শত্রুপুরীতে তোমাকেই একমাত্র বন্ধু বলে মনে হচ্ছে। এখানে তোমার একটা হিল্লে হয় না?

আর হবে কী করে?

এখানে না একটা ইস্কুল আছে, চাকরি চাও না।

চাকরি কি ছেলের হাতের মোয়া? মাধ্যমিক পর্যন্ত বিদ্যে। তাতে ইস্কুলের চাকরি হয় না।

আমার ফুলিরও আসছে বছর মাধ্যমিক দেওয়ার কথা। সে কি আর পারবে? ঠাঁই-নাড়া হয়ে সব ভেস্তে গেল।

ফুলিটা কে।?

আমার বড় মেয়ে, ঐ যে চা দিয়ে গেল তোমাকে।

ওই বড় বুঝি?

হ্যাঁ, ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় পা। লেখাপড়ায় ওরই যা একটু মাথা। অন্যগুলোর নয়। এখানে ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার কথা, উনি কী করবেন উনিই জানেন।

আপনি পান খান নাকি?

খাই।

আমি একটা খাবো।

ওমা। নিশ্চয়ই। নিয়ে আসছি। জর্দা দোক্তা খাও ভাই?

না। এমনই সাদা পান হলেই হবে।

দিয়ে যাচ্ছি।

বউটা গেল, পান নিয়ে ফিরেও এল। বলল, বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল ফুলির বাবা। কী হবে, কী শুনে আসবে কে জানে। বুকটা বড় কাঁপছে।

দুর-দুর, ভাবছেন কেন? এ সব আপনাদেরই।

সে কথা তো, শুধু তুমিই বলছো আর তো কেউ বলছে না। আমার তো এত চাই না। অনেক কম হলেও চলে। আঁটপুরে অনেক ধারকর্জ হয়ে গেছে, সংসারও অচল হয়ে আসছিল। তাই বাস উঠিয়ে আনা।

গদাই কী করেন?

কী যে করেন তা উনিই জানেন। আগে আদালতে কি সব স্ট্যাম্প

কাগজ-টাগজ বেচতেন। তাতে কি পোষায়? জমিজমা যা ছিল তাও বিক্রি টিক্রি করতে হয়েছে।

পিসির এক ভাসুরপো আগে আসতেন-টাসতেন বলে শুনেছি। সে আমার জন্মের আগেকার কথা। নাম-টামও জানি না। তিনি কি বেঁচে আছেন?

বউটার মুখখানা কেমনধারা হয়ে গেল। মাথা নেড়ে বলল, না, বেঁচে নেই।

তিনি বোধহয় আপনার ভাসুর, তাই না?

হুঁ।

কিন্তু প্রসঙ্গটা যেন পছন্দ করছে না বউটা। হঠাৎ বলল, তুমি আমাকে বউদি বলে ডেকো কেমন?

বলে বউদি চলে গেল। ও ঘরে দুটো বাচ্চা খুব চেঁচিয়ে কাঁদছে।

বৃষ্টির জোর বাড়ছে বই কমছে না। একেবারে বল্লমের মতো এসে গেঁথে যাচ্ছে মাটিতে। হ্যারিকেন হাওয়ায় লাফাচ্ছে। দরজাটা বন্ধ করতে হল। ঘরে হাত-পা গুটিয়ে এই বসে থাকাটার কোনও মানে হচ্ছে না। স্যান্ডেলের বিলে যা হোক করে সময়টা কেটে যায় ঠিকই। চালভাজা জিনিসটা যে এত ভাল জানা ছিল না নিরাপদর। ছোলা ভাজা, মুগ ভাজা, মশলার গুঁড়ো এত সুন্দর মিলমিশ হয়েছে যে বলার নয়। আর মুড়মুড়েও খুব। বাদলার দিনে বেশ লাগছে খেতে।

দরজায় একটা ধাক্কা পড়তে উঠে গিয়ে কপাট খুলে দেখে, ফুলি।

মা জিজ্ঞেস করল আর দুটি চালভাজা দেবে কি না।

লজ্জা পেয়ে নিরাপদ বলে, না না, আর লাগবে না। বেশ হয়েছে খেতে, তোমার মাকে বোলো। বাটিটা আমি ধুয়ে দিয়ে আসব খন।

আপনি ধোবেন কেন? আমি ধুয়ে নেবো।

সাঁই সাঁই বাতাসে বৃষ্টির ঝাপটায় বারান্দা ভিজে যাচ্ছে। সে বলল, ভিজছো কেন? ঘরে যাও।

হ্যাঁ। বাবার জন্য ভাবছি, কখন গেছে।

এসে যাবেন। বাদলায় আটকে পড়েছেন কোথাও, গাঁ-গঞ্জ জায়গা, চিন্তার কিছু নেই।

মেয়েটা চলে গেল, ফের দোর দিল নিরাপদ। ঘণ্টাটাক বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবল। টের পেল, বৃষ্টির মধ্যে গদাই দাস ফিরেছে। ফিরেই একটু হাঁক ডাক করছে। উঠে গিয়ে দরজায় কান পাতল নিরাপদ। শুনল, গদাই দাস বলছে, কালকেই সব সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

রাত্রে দু তরফেই খিচুড়ি। মোক্ষদা এসে বলল, আজ আর রান্নাঘরে যাওয়ার জো নেই। জানালার একটা পাল্লা ভাঙা বলে জলে ভাসিয়ে নিয়েছে। তাই আজ মাসিমার ঘরেই রান্না করেছি স্টোভ জ্বেলে। খাবে এসো।

পিসির ঘরে এই প্রথম ঢুকল নিরাপদ এ যাত্রায়। পর পর দু খানা মস্ত ঘর। গাঁয়ের ঘর যেমন হয় তেমনই। তবে খুব যত্ন-আত্তির ছাপ রয়েছে। পরিষ্কারও খুব। দু ঘরেই গোটা কতক কাঠের আলমারি, একখানা সিন্দুক। মস্ত খাট। ঠাকুরের আসনও আছে।

মোক্ষদাদিদি, পিসি আর তুমি দুজনে থাকতে, ডাকাতির ভয় ছিল না?

ছিল না আবার! খুব ছিল। তবে এ গাঁয়ে কিছু লেঠেল থাকে। উত্তরের পাড়ায় চাপ বেঁধে তাদের ঘর। তাঁতের কাজ করে। তাই আশেপাশে ডাকাতি হলেও ভাঙনে বড় একটা হয় না। বাইরের ডাকাতের আর দরকারই বা কী, দেখছ না ভিতরেই ডাকাত হয়ে পড়ছে।

সে কিরকম?

এই যে গদাই দাস গুষ্টিসুদ্ধু এসে ঘাড়ে চাপল এও তো ডাকাতি বই নয়।

উনি তো ওয়ারিশ।

হুঃ। পেটে যা খিদে দেখছি, মাসির গোলা দু'দিনেই ফাঁকা হয়ে যাবে।

রাতে নিরাপদর ভাল ঘুম হল না। দুপুরে খুব ঘুমিয়েছে। হাঁটাচলাও নেই তেমন। মাঝরাতে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পর সে একটু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। চারদিকটা ভেজা, স্যাঁতানো। বাতাসটা খুব ঠাণ্ডা। ব্যাঙ ডাকছে

খুব।

দাঁড়াতেই কথা কানে এল। গদাই দাস আর তার বউই হবে। দরজায় গিয়ে কানটা একটু পাতল নিরাপদ।

গদাই বলল, হয়েই যাচ্ছে ধরে নাও।

সে তো তুমি বরাবরই বল। কেবল বল-ভরসার কথা। কাজ তো কিছু এগোয় না।

এবারটা দেখই না। ছোঁড়াটা কী বলছে-টলছে?

ছেলেটা খুব ভাল।

ভাল? খুব লোক চিনেছো তাহলে। উড়ে এসে জুড়ে বসার লক্ষণ দেখছ না? কথা ছিল আজই চলে যাবে। গেল? ও হচ্ছে মোক্ষদার লোক। এই মোক্ষদাকে আমি ঝেঁটিয়ে তাড়াব। বড্ড আস্পদ্দা মাগীর।

ছেলেপুলেগুলোকে ইস্কুলে ভর্তি করতে হবে, মনে রেকো। ইস্কুলে গিয়ে কথা টথা কয়েছো?

সে হবে খন। মোক্ষদা মাগী দলিল দস্তাবেজগুলোই এখন দেখাতে চাইছে না। কিরকম সব আছে টাছে তার একটা আন্দাজ পেলে হত। ভালই হবে কী বলো?

তার আমি কী জানি?

নগদে গয়নায় কত আছে তারও হিসেব নেই। ও মাগী সব না সরিয়ে ফেলে। চাবি-টাবি সব ওর কাছে। এমন কাণ্ড জন্মে দেখিনি বাবা। বাড়ির ঝিয়ের কাছে সব গচ্ছিত। সব্বোনেশে ব্যাপার।

কত আর সরাবে!

হুঃ। কত আর সরাবে। এ না হলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি! সব সরাবে। এই বলে রাখলুম ওই, আলমারিটারি খুলে কুটোগাছটিও পাবে না।

মাথা গরম না করে এখন ঘুমোও।

মাথাটা বড্ডই গরম। এই ছোঁড়াটা এসে পড়ায় অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়েছে।

ছেলেটা তো দাবি-দাওয়াই তুলছে না।

মিটমিটে ডান। মানুষ চরিয়ে খাই, বুঝলে? সব মাল চিনি।

নিরাপদ ঘরে এসে দরজাটা খুব আস্তে বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। মাথাটা তারও গরম। এখানে তার আর ভাল লাগছে না।

সকালে তিনটি লোক এল। বিষ্ণুবাবু, নবীনবাবু আর সুধীরবাবু। বেশ জবরদস্ত তিনজন। বিষ্ণুবাবুর বয়স ষাটের কোঠায়, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, মুখচোখে বেশ বুদ্ধির ছাপ। নবীনবাবু বয়সেও নবীন, বয়স ত্রিশের কোঠায়। পঞ্চায়েতে জিতেছেন, সুধীরবাবুকে অবশ্য চেনে নিরাপদ। সঙ্গে নেলো।

নেলো তাড়াতাড়ি তিনখানা কাঠের চেয়ার বের করে বারান্দায় পেতে দিল। গদাই দাস খুব হেঁ-হেঁ করতে লাগল সামনে দাঁড়িয়ে।

বিষ্ণুবাবু বললেন, ও সুধীর, জিজ্ঞাসাবাদ যা করার তুমি করো।

সুধীরবাবু বললে, জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। আপনি চিনলেই হবে।

ও নবীন, তুমি?

আজ্ঞে আমারও ওই কথা।

বিষ্ণুবাবুর মুখখানা বড্ড ঢলঢল করছিল। চারদিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললেন, তা হলে তো আর সমস্যা কিছু হচ্ছে না। গদাধরই দেখা যাচ্ছে একমাত্র ওয়ারিশ। তা হলে আপাতত —

সুধীরবাবু মন দিয়ে একটা দলিল দস্তাবেজ গোছের কিছু দেখছিলেন নিচু হয়ে। হঠাৎ মুখ তুলে গদাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কি পূর্ণচন্দ্র দাসের ছেলে?

গদাই হেঁ হেঁ করে বলল, ইয়ে হ্যাঁ।

আমাদের যা জানা আছে, কৃষ্ণচন্দ্র আর পূর্ণচন্দ্র দুই ভাই। তাঁদের বাবার নাম অঘোরচন্দ্র দাস। ঠিক তো!

যে আজ্ঞে।

কৃষ্ণচন্দ্র বাস করতেন ভাঙনে। পূর্ণচন্দ্র থাকতেন আঁটপুরের কাছে জেলেপাড়ায়।

যে আজ্ঞে।

পূর্ণচন্দ্রের কয় ছেলে?

দাদা ছিলেন মাধব দাস। নিঃসন্তান মারা গেছেন।

তাঁর বিধবা?

মুখটা একটু শুকোলো গদাইয়ের। বলল, তাঁর কোনও খবর নেই। বোধহয় মারা টারা গেছেন।

তা হলে তো কথাই নেই। কিন্তু বেঁচে থাকলে তাঁরও ভাগ আছে।

বিষ্ণুবাবু গলায় একটা ঘরঘর শব্দ করে বললেন, ফ্যাকড়া তুলে লাভ কী? ও ছেড়ে দাও।

আমরা ছাড়লে ছাড়তেই পারি। আদালতে মামলা উঠলে কথাটাও উঠবে।

ফুলি প্লেটে করে তিনজনের জন্য নাড়ু আর মোয়া নিয়ে এল। পিছনে দুটো দুটো ভাইয়ের হাতে তিন গেলাস জল।

নবীনবাবু আর বিষ্ণুবাবু প্লেট নিলেন। সুধীরবাবু নিলেন না। হাতের কাগজেই অখণ্ড মনোযোগ। খানিক বাদে মুখ তুলে বললেন, তা হলে আপনিই এক নম্বর ওয়ারিশ।

হেঁ হেঁ, আপনাদের দয়া।

দয়া! দয়া কিসের! নিজের ন্যায্য পাওনাগণ্ডা বুঝে নেবেন। দয়ার কথাই আসে না।

আজ্ঞে, তবু এখানে তো আপনাদের আশ্রয়েই থাকা।

সুধীরবাবু নেলোর দিকে চেয়ে বললেন, একটু মোক্ষদাকে ডাকো তো।

সুধীরবাবু মাথাটা নিচু রেখেই বললেন, বিন্দুবাসিনীর এক ভাসুরপো আসত না আগে?

হ্যাঁ।

কী নাম?

মাধব।

তাকে মনে আছে?

গায়ের রং কালো ছিল খুব। জোয়ান ছিলেন, আবছা আবছা মনে আছে।

তার বাপের নাম জানো?

অঘোর দাস। ঘরে তার ছবি আছে।

ছবি আছে? আর কার ছবি আছে?

সবারই আছে।

কার কার?

মাধব দাস, কৃষ্ণ দাস, পূর্ণ দাস।

গদাইবাবুর ছবি নেই?

না। থাকার কথাও নয়।

কথা নয়?

না, মাসিমার কাছে শুনেছি, পূর্ণ দাসের একটাই ছেলে। মাধব দাস।

ভুল শুনেছো হয়তো।

না, ভুল শুনবো কেন?

সুধীরবাবু ফের কাগজের দিকে মন দিলেন। বিষ্ণুবাবু একটা নাড়ু মুখে দিয়ে বললেন, শোনা কথা তো! ও রকম হয়।

মোক্ষদা বলল, আমি অত, জানি না বাপু। যা জানি বললাম।

সুধীরবাবু মুখ তুলে যেন খুব আনমনে বললেন, বিষ্ণুবাবু, কথাটা যখন উঠেছে তখন খোঁজখবর একটু করতেই হচ্ছে।

গদাই কেমন যেন কাঁপছিল। কেমন যেন ফ্যাকাসে মেরে, সিঁটিয়ে কেমনধারা মুখ হয়ে যাচ্ছিল। একটু ক্যাবলা হাসির সঙ্গে ভয় আর কান্না মেশালে যেমনটা হয়। একটু কাঁপা গলায় বলল, আজ্ঞে, আমিই সেই লোক — বিশ্বাস করুন।

সুধীরবাবু হাতের কাগজের দিকে চেয়ে থেকেই বললেন, বিষ্ণুবাবু যখন বলছেন তখন আর কথা কিসের? কিন্তু পরে কোনও কথা যাতে না

ওঠে তার জন্যই সাবধান হওয়া ভাল। নইলে বিষ্ণুবাবুকেই বেইজ্জত হতে হবে। কী বলেন বিষ্ণুবাবু?

বিষ্ণুবাবু উদাস মুখে নাড়ু চিবোচ্ছিলেন। মুখ রসস্থ, কথা এল না। আর একখানা নাড়ু তুলে নাচাতে নাচাতে বললেন, সেরকমই তো বলছিল যেন। আঁটিপুরের লোক বলেই চিনি। তা দেখ তোমরা। বলো তো আমিই আবার আঁটিপুরে গিয়ে ঘুরে আসি।

নবীন একটু চুপ করে ছিল এতক্ষণ। এ বার বলল, গণ্ডগোলটা যে কোথায় তা ধরতে পারছি না। ও মশাই, আপনি কার কে হন পষ্ট করে বলুন তো?

গদাই বোধহয় মূর্ছাই যেত। এমন ঘাবড়ে গিয়েছিল এ কথায় যে বলার নয়। কিন্তু ঠিক এই সময়ে তার বউ বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

আমি বলছি। আমার কথায় কি হবে? আমি ওঁর পরিবার।

নবীন ঘাড় হেলিয়ে বলল, হবে।

উনি ভাসুরপো নন।

তাহলে?

উনি আমার ভাসুর মাধববাবুর আপন মামাতো ভাই।

বিষ্ণুবাবু আর একটা নাড়ু মুখে ফেলে বললেন, এই তো, শুনলে তো! মাধবের মামাতো ভাই, তা তাতেও অর্শায়।

সুধীরবাবু মাথাটি মৃদু একটু নাড়া দিয়ে বললেন, না। অর্শায় না।

কেন, ওদিকে তো আর কোনও দাবি ওঠেনি।

দাবি উঠলেও কিছু নয়। আইনে টেকে না।

কেন হে, টিকবে না কেন? মাধব বেঁচে থাকলে সম্পত্তির মালিক হত, মাধবের অবর্তমানে পায় তো —

সুধীরবাবু ঘন ঘন মাথা নাড়া দিয়ে বললেন, বিষ্ণুবাবু, এই ভাঙন গাঁয়ের আইন বলুন, আদালত বলুন সে আপনিই। আপনার ওপর কথা কিসের? তবে কি না আইনে যা বলে তাতে গদাধর দাস এই সম্পত্তির ওয়ারিশ নয়। কৃষ্ণচন্দ্রের দিককার আর কোনও দাবিদারও থাকছে না।

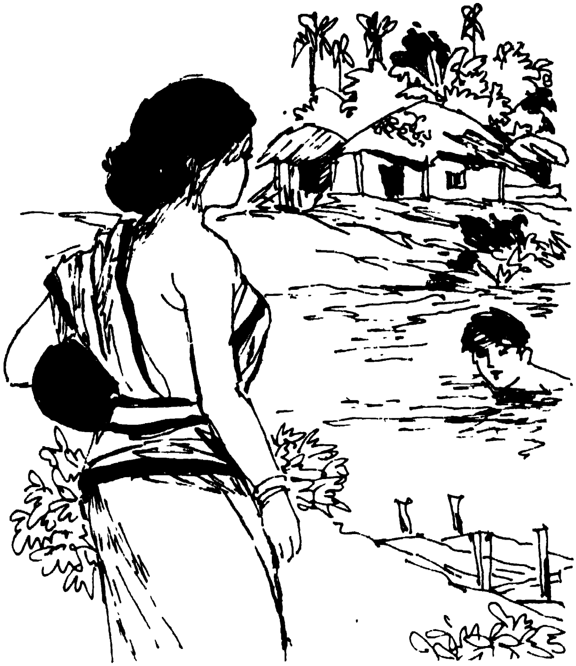
তা হলে?

বিন্দুবাসিনীর দিকে থাকছে।

তাই নাকি? আইন তাই বলছে?

সে রকমই ব্যাপার। তবে আপনি যদি বলেন তা হলে সবই হতে পারে। কিন্তু তাতে বদনামের ভয় আছে।

গদাই দাস মাথায় হাত দিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল। কোঁকানির মত একটা শব্দও বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। কাহিল গলায়। বলল, আমার মাথাটা বড্ড ঘুরছে।



॥ চার ॥

ও তরফে আজ অরন্ধন। গদাই সেই সে শয্যা নিয়েছে, আর ওঠেনি। বউটা কেঁদে কেটে এখন ঘরে বসে আছে। আজ বাচ্চাগুলো পর্যন্ত তেমনই হইচই করছে না। ছোটো তিনটে ঘুরঘুর করছে বাগানে। জল-কাদা মাখছে, কেউ গ্রাহ্য করছে না।

রান্নাঘরে নেলো আর নিরাপদ পাশাপাশি খেতে পসেছে। নেলো উবু হয়ে, নিরাপদ আসনপিঁড়িতে। মোক্ষদা খেতে দিতে দিতে বলল, হল তো ছেলে! এখন এঁটে বসে থাকো।

নিরাপদ বুঝতে পারছে, গদাই দাস হেরে গেছে। সে জিতে গেছে। তবু মনটা কি ভাল লাগছে তার? আনন্দ হচ্ছে কি? হচ্ছে না। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কী যে হল কিছুই বুঝতে পারলাম না।

নেলো হুঁ-হুঁ করে একটা শব্দ করল। মোক্ষদা বলল, সে অনেক কথা।

মাসিমা বেঁচে থাকতেই বিষ্ণুবাবু নানারকম ফিকির শুরু করেছিল। ও মানুষকে তো চেনো না। বহুকাল ধরে জ্বালাচ্ছে। বিধবা অনাথা দেখে মাসিমাকে নানা ভাবে নাকাল করেছে। তিন বিঘে জমি বেমালুম গাপ করে দিল। তাতে কি নোলা কমেছে? আরও খাবে। তাই আঁটপুরে গিয়ে মাধব দাসের ভাইকে জপিয়ে রেখেছিল। তা গদাই দাসও অভাবী লোক, লোভী। গদাইকে গদিতে বসিয়ে সম্পত্তিটা বিষ্ণু আর গদাইয়ে বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার মতলব ছিল।

তোমরা টের পেলে কী করে?

ও তরফ সে সাফ হয়ে গেছে তা মাসিমার কাছেই শুনেছি। যখন বিষ্ণুপদ ফন্দি আঁটিতে লেগেছিল তখনই মাসিমা আমাকে বলেছিল, ও মোক্ষদা, বিষ্ণুর মতলব ভাল নয়। ও আমার সব গ্রাস করবে। আমার একজন মুরুব্বির দরকার। তখনই ওই সুধীরবাবু মাসিমাকে ভরসা দেয়। আঁটপুরে গিয়ে খোঁজখবর করে পালটা ফন্দি বের করে রাখে। মাসিমার খুব ইচ্ছে ছিল তোমাদেরই সব দিয়ে যায়। দুঃখ করে বলত, আমার ভাইটা বড় কষ্ট করে গেছে, আমার যা খুদকুঁড়ো আছে ওদেরই দিয়ে যাবো। সে বাবদে একটা কাগজও আছে সুধীরবাবুর কাছে। মাসিমার নিজের হাতে লেখা।

তা হলে এত কিছু হতে গেল কেন?

বিষ্ণুপদর মতলবটা বুঝতে হবে না? ভাঙন গাঁ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাচ্ছে তো ওই একটা লোক। পাজির পা-ঝাড়া। কেউ কিছু বলতে সাহসও পায় না। পয়সার জোর আছে, জনবল আছে। আগে থেকে জানাজানি হলে ও লোক ঠিক আর একটা ফন্দি এঁটে ফেলত। তা বলে ভেবো না তোমাকেও নিষ্কণ্টক থাকতে দেবে। যখন এখানে বাস করবে তখনই বুঝবে। এ সম্পত্তির ওপর ওই শকুন বহুকাল নজরে দিয়ে রেখেছে। মাসিমা মরার পরদিনই এসে আমার কাছে চাবি চেয়েছিল। বলল, এ সব বাড়িঘর এখন গাঁয়ের মাতব্বরদের জিম্মায় থাকবে। আমি রুখে উঠে দু কথা শুনিয়ে দিলুম। তখন পালাল। সোজা পাত্তর ভেবো না।

নিরাপদ ক্রমে ক্রমে কেমন যেন নিবে যাচ্ছে। ও তরফ আজ বড় ভেঙে পড়েছে। গদাইয়ের এমন অবস্থা হয়েছিল যে নিরাপদর একসময়ে ভয় হয়েছিল, লোকটার না স্ট্রোক হয়ে যায়।

নেলো ভাতের পাহাড় এক চোপাটে উড়িয়ে দিয়ে ফের ভাত আর ডাল নিল। সঙ্গে লঙ্কা। লঙ্কাটার অর্ধেক কামড়ে চিবোতে চিবোতে বলল, মামার বাগানে বিয়োলো গাই সে সম্পর্কে মামাতো ভাই। মামাতো ভাই এসেছেন খাবলা মারতে। বিষ্ণুখুড়োর বিষয়বুদ্ধি বটে। তা পারল সুধীরবাবুর সঙ্গে? কেমন ঝামা ঘষে দিল।

নিরাপদ বুঝল, এরাও দু তরফ। এক তরফ সুধীরবাবুর, অন্য তরফ বিষ্ণুবাবুর। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ফাটা বাঁশের মাঝখানে সে।

খেয়ে উঠে অনেকটা চোরের মতোই নিজের ঘরে এসে বসল নিরাপদ। বাইরে মেঘ চেপে আসছে। উথালপাথাল হাওয়া ছেড়েছে। জম্পেশ করে নামবে এ বার। জানলার আলগা দুটো পাল্লা ফটাস ফটাস করে বন্ধ হয়ে খুলে যাচ্ছে। জানালাগুলো এঁটে দিল সে। ঘর অন্ধকার। মনটাও তাই কেন যে মনটা এমন ডাউন মেরে আছে তা বুঝতে পারছে না। শুয়ে শুয়ে খানিক ভাবল। ভেবে কোনও লাভ হল না।

বউদি এল বৃষ্টি নামার পর।

ঘুমোচ্ছো ভাই?

না না। বলে তাড়াতাড়ি উঠে বসে নিরাপদ।

বউদি কাঠের চেয়ারখানায় বসে পড়ল। বলল, আজ আর যাওয়া হবে না। যা দুর্যোগ। তবে গোছগাছ করেই রেখেছি।

কোথায় যাবেন?

বউদি একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, কোথায় আর! সেই আঁটপুরে। উনি লোভে পড়ে ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। কী আর বলব তোমাকে, লজ্জার কথা।

আপনারা আজ রান্না করলেন না?

না ভাই, আজ আর ইচ্ছে হল না। গলা দিয়ে নামবেও না।

বাচ্চাগুলোকে চালভাজা, মোয়া, নাড়ু খাইয়ে রেখেছি। উনি তো শয্যাই নিয়েছেন। বড্ড লোভী মানুষ। অভাবীও তো। বিষ্ণুবাবু খুব ভরসা দিয়ে এনেছিলেন। তিনি তালেবর লোক। বলেছিলেন, ভাগনে আমার কথাই হল আইন। সেই ভরসায় উনি নেচে উঠেছিলেন।

বন্দোবস্ত কিরকম ছিল?

সেটা কী ভাই?

মানে বিষ্ণুবাবুকেও তো কিছু দিতে হত।

তা আমি জানি না। সে সব কি আর আমাকে বলবেন ওরা?

আমার বড্ড খারাপ লাগছে।

সে তো আমাদেরও লাগছে। কিন্তু ভাই, কাজটা তো ধর্ম হত না। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি। অধর্ম যদি না সয়? যা হল ভালই হল।

আঁটপুরে আপনাদের কী করে চলবে?

যেমন চলছিল। বাড়িখানা তো আছে। আর আমি তো বসে থাকি না। চালভাজা, মুড়ি, খই, নাড়ু মোয়া, চন্দ্রপুলি তৈরি করি। সে সব কেনার খদ্দের আছে। কোনও রকমে চলে যায়। উনিও কিছু আনেন। টানাটানি তো আছেই।

তবু খারাপ লাগছে।

তুমি বড্ড ভাল ছেলে তো, তাই তোমার খারাপ লাগছে। উনি তোমার ওপর খাপ্পা হয়ে আছেন বটে, কিন্তু সে ওঁর স্বভাবই ও রকম। মানুষটা বিচক্ষণ নয় মোটেই। লক্ষ্মীছাড়া মানুষ। বড্ড ভীতু। ভীতু বলেই ও রকম ধারা করছিল তোমার সঙ্গে।

খুব ভেঙে পড়েছেন বুঝি?

হ্যাঁ। তবে আমি বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করেছি। বলেছি, যার ন্যায্য পাওনা তাকে বঞ্চিত না করে ভালই হয়েছে। এখন তো ভাই সবই তোমার। আমাদের আজ রাতটা থাকতে দেবে তো?

আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। এসেছিলাম বটে লোভে পড়ে। কিন্তু আমার আর কেমন যেন লোভটোভ হচ্ছে না।

আমি ফুলিকে কী বলেছি জানো? বলেছি নিরাপদকে দেখলে ভারি ভক্তি হয়। ওর লোভটোভ নেই।

আবার লজ্জা দিচ্ছেন।

হ্যাঁ ভাই, এই গরিব বউদির বাড়ি একবার যাবে? খুব যত্ন করব, দেখো। তোমাকে আমার ভীষণ ভীষণ ভাল লেগেছে।

আপনিও খুব ভাল।

বললে! মনে থাকে যেন। ভাল যখন বলেছো তখন আমার কাছে যেতেই হবে।

যাবো বউদি।

যেও ভাই। আঁটপুর বেশ জায়গা। পুরনো বড় গ্রাম। অনেক লোকের বাস। বললে বিশ্বাস যাবে না, দশখানা দুর্গাপুজো হয়। আঁটপুর ছেড়ে আসতে মন চাইছিল না। হ্যাঁ ভাই,তুমি কি এখানে একা থাকবে?

নিরাপদ ব্যাজার মুখ করে বলল, থাকার তো ইচ্ছে ছিল না। এ খুব প্যাঁচের জায়গা। শত্রুতাও আছে। তবে মোক্ষদাদিদি আর নেলো তো ছাড়বে না। থাকতেই হবে বোধহয়।

কেন ভাই, বিয়ে-টিয়ে করে সংসার পেতে বসো না? কত বয়স হল তোমার? পঁচিশ-ছাব্বিশ না?

ছাব্বিশ।

বিয়েরই তো বয়স।

ও সব কথা কে ভাবছে। নিজেরই পেট চলে না।

বউদি ফিক করে হেসে ফেলল, এই কথা? কাকিমার সম্পত্তির হিসেব জানো না বুঝি? তিন বিঘে তো শুধু নারকোল গাছ। ধানী জমি কুড়ি বিঘের ওপর। একখানা পুকুর আছে। আরও কত কী বেরোবে।

যা গণ্ডগোল। আগে তো পাই।

পাবে গো পাবে। আমি কিন্তু বড্ড খুশি গিয়েছি। তোমার মুখখানা দেখে এমন মায়া হয়েছিল। ওই উনি ডাকছেন। যাই।

বউদি চলে গেল। মনটা যেন আরও দড়কচা মেরে গেল নিরাপদর।

কী যেন একটা মনের মধ্যে। একটা আকুলি-ব্যাকুলি। তার ইচ্ছে করছে এই ভালমানুষ বউদিটার জন্য কিছু করতে। কিন্তু কী করবে সে?

বৃষ্টিটা এল একেবারে টগবগ করতে করতে। চারদিক এমন অন্ধকার করে ফেলল যে বাতি না জ্বাললে ঘরের ভিতরে কিছুই দেখার জো রইল না, নিরাপদ দোর দিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল ঘরে। কিন্তু ঘুম এল না। মাথাটা একটু গরম। আকাশের তবিলে আর কত বৃষ্টি জমা আছেকে জানে বাবা! এত ঢেলে ঢেলেও শেষ হচ্ছে না।

ওই বৃষ্টির মধ্যেই শেষ দুপুরে দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুলতেই বাতাসের ঝাপটায় দড়াম করে পাল্লা ছিটকে খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে ফুলি। হাতে ঢাকা দেওয়া চায়ের কাপ আর একটা পেতলের বাটি আঁচলের তলায়। ভিজছে বৃষ্টির প্রবল হ্যাঁচলায়।

ঘরে সোমত্ত মেয়ে, দরজাটা বন্ধ করা উচিত হচ্ছে না হয়ত। কিন্তু যা হ্যাঁচলা, বন্ধ না করলেও উপায় নেই বলে বন্ধ করতে হল তাকে।ঠেলেই লাগাতে হল পাল্লা, এমন বাতাস। উত্তরে বাতাস নেই। জানালাটা খুলে দিল।

এঃ, ভিজেই গেছ একেবারে!

ফুলি চায়ের কাপ আর চালভাজার বাটি চেয়াটার ওপর রেখে ভারি সুন্দর করে হাসল। বলল, ও কিছু নয়। আপনি খেয়ে নিন।

কেন কষ্ট করলে? মোক্ষদাদিদি তো চা দেবেই।

আমরা তো আর দেব না।

কথাটা এমনভাবে বলল যে বুকটার মধ্যে একটা মোচড় দিল নিরাপদর।

দেখুন, বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। যা বাতাস।

নিরাপদ চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, না ঠাণ্ডা হয়নি। বেশ চা। তুমি চা করতে পার তোমার মায়ের মতো?

পারব না কেন? এটা তো আমিই করেছি।

নিরাপদ লজ্জা পেয়ে বলল, বেশ হয়েছে তো!

ফুলি আবার একটু হাসল।

নিরাপদর মনে হচ্ছিল, একটা লাগসই কথা তার বলার দরকার। কিন্তু কী কথা তা তার পেটে আসছিল, মুখে আসছিল না। চায়ে ফের একটা চুমুক দিয়ে বলল, আঁটপুরে ফিরে যেতে তোমাদের খুব খারাপ লাগবে, না?

ফুলি অবাক হয়ে বলল, না তো! আঁটপুরে থাকতেই তো আমরা খুব ভালবাসি।

ও। বলে নিরাপদ খুব কষে ভাবছিল। কী বলতে চায় সে? না, মনে আসছে না। পেটের মধ্যে গুড়গুড় করছে।

আপনি খান, আমি পরে এসে এঁটো কাপ নিয়ে যাবো।

হ্যাঁ। আমিও ধুয়ে দিতে পারি।

না। আপনি ধোবেন কেন?

খিল খুলতে ফুলি যখন হাত বাড়িয়েছে তখন নিরাপদ বলল, ইয়ে, বুঝলে —

ফুলি ফিরে চাইল, কী বলছেন?

এ জায়গা তোমার ভাল লাগে না, না?

না, বিচ্ছিরি জায়গা।

ও। তা ইয়ে —

কী?

না ধরো যদি এখানেই থাকা সাব্যস্ত হয়?

না তো। আমরা কাল চলে যাচ্ছি।

হ্যাঁ, তা জানি। ধরো, যদি ইয়ে —

বলুন না। কী?

যদি থাকতে হয় তো পারবে?

কেমন করে থাকব। আমরা তো চলেই যাচ্ছি।

তা জানি। ধরো তোমাকেই যদি থাকতে হয়?

আমি?

হ্যাঁ। মানে ব্যবস্থা যদি একটা হয় তাহলে পারবে?

ফুলি খিলটা খুলে ফেলতেই হাউড় বাতাসে দুটো পাল্লা দড়াম করে খুলে গেল।

তার মধ্যে গলা তুলে নিরাপদ জিজ্ঞেস করল, পারবে না?

ফুলির মুখের জবাব লুটেরা বাতাস কেড়ে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মধ্যেও নিরাপদ শুনতে পেল, পারব।

